আর্য্য-প্রবর।

তত্ত্ব-বোধক মাসিক পত্র।

"তথা বিজ্ঞান বশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রসীদতি।"

১ম পর্ব্ব] সম্বৎ ১৯২৯। জ্যৈষ্ঠ। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৷৷৵০ [৫ম খণ্ড।

আত্মীয়তা ভেদ।

ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ ভেদ নাই, কাউপার সাহেবের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য যদ্যপি আমরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে অবশ্য সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে, অন্ন বা আচার ব্যবহারে জাতিভেদ করে না, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে জাতি ভেদ করে না, দুই জাতির অন্তর্ব্যবহিত পর্ব্বতই জাতিভেদের হেতু। ভিন্ন ভিন্ন জাতির গোঁড়ামিপর্ব্বতই মনুষ্য শ্রেণী পৃথক করিতেছে। এই গোঁড়ামি মহাশৈল দুর্লঙ্ঘনীয়, জগতে কোন কালে যে মনুষ্যজাতি ঈশ্বর প্রণয় বশে পরস্পর সদ্ভাবে আলিঙ্গন করিবে তাহার আশা নাই, আমাদের হৃদয় এমনি পাষাণ! আমাদের বিশ্বাস এমনি দুর্ব্বল! যদ্যপি মানবের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরীয় বিশ্বব্যাপক প্রেম প্রগাঢ় রূপে অঙ্কিত করা হইত তাহা হইলে এই সংসার কি সুখের হইত! বিজন অরণ্যেও আমরা পরম মিত্রের মুখাবলোকন করিতাম, মহা বিপদেও আমরা বন্ধুর আশ্বাস পাইতাম, মৃত্যু সময়েও আমরা পবিত্রলোকে বেষ্টিত হইয়া সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিতাম, সংসারের কল্যাণ চেষ্টার নিমিত্ত সকলেরই হৃদয়ে আত্মীয়তা বহ্নি পরস্পর প্রজ্বলিত হইত, সকলেরই হৃদয়ে বন্ধুতাভাব সমান প্রকাশ পাইত, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরনিন্দাপ্রভৃতি অতি পশুবৎ হিংস্র প্রবৃত্তি সকল যে মনুষ্য হৃদয় হইতে সর্ব্বদা গরল উৎপন্ন করে, সেই হৃদয়ে শান্তি অমৃতের অনিবার্য্য স্রোত প্রবহমান হইত। হায়! ধর্ম্মান্ধতায় মনুষ্য সংসারকে কি ভয়ঙ্কর করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা মনে করি ভীষণ অরণ্য স্থান হইতে দূরে থাকিয়া পরম সুখ পাই, হিংস্রজন্তু সকল হইতে দূরে সুখী হই, মনুষ্য সমাজে ভয় নাই, আপদ বিপদ কিছুই নাই, কিন্তু মনুষ্য সমাজে যদি ভয় আপদ বিপদ নাই, তবে কোথায় আছে, মনুষ্য সমাজে যদি দ্বেষ হিংসা নাই, তবে কোথায় আছে, ধর্ম্ম গোঁড়ামির হিংসাতে মনুষ্যগণ পরস্পর স্বভাবসিদ্ধসরলতা পবিত্রতা সাধুতা জলাঞ্জলী দিয়া হিংসানলে চতুর্দ্দিক দহন করিতেছে। বংশ পরম্পরায় মনুষ্য হৃদয়ে অসৎ বুদ্ধি জন্মিতেছে, পৃথিবীর অতুল অনিষ্টকর ধর্ম্মের গোঁড়ামি মনুষ্য সমাজ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত মনুষ্যসমাজে প্রবিষ্ট

হইয়াছে ঐ সকল সমাজ হইতে দূর হউক, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই অভিলাষ সভ্যতার বিমল জ্যোতিতে আমরা ইংলণ্ডের নিকট অনেক গুণ শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু ইংলণ্ডেই ধর্ম্মের ঘোরতর সাম্প্রদায়িক কলহ আছে, অন্য কথার প্রয়োজন কি।

যাহা হউক ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ সকল কার্য্যে ভারতবর্ষ অগ্রসর হউক, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অপগত হউক, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা, এবং ভারতবর্ষের যে সকল প্রাচীন শুভকর রীতি আছে তাহাও যেন আমরা বিস্মৃত না হই এই আমাদিগেরই নিতান্ত অভিলাষ।

হিন্দুমেলা।

দেশ হিতৈষী বাবু নবগোপাল মিত্র কেবল প্রগাঢ় স্বদেশীয় স্নেহ বশতঃ চৈত্র মেলার অনুষ্ঠান করেন, এই জাতীয় প্রণয় বর্দ্ধক অনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দু জাতির কি প্রকার উপকার দর্শিবেক, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রের পরম প্রাজ্ঞ সম্পাদকেরা তাহা জন সাধারণের সুগোচর করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই মেলা দুর্লভ ফলপ্রসূ মহাতরু স্বরূপ। ইহার মূলে সযত্নে বারি সিঞ্চন করা বিধেয় কিন্তু আমাদের দেশে নূতন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইতে সহজেই কেহ পারে না। অনেক পীড়া পীড়ি না করিলে হিন্দু সমাজের নিদ্রাভঙ্গ হয় না, বিশেষতঃ এ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগের জীবন অতি স্বতন্ত্র। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে জলের পরমাণু পর্য্যন্ত উপলব্ধ হয়, কিন্তু আমাদের দেশে ঐ সকল লোকদিগের অন্তঃকরণ কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই দর্শন হয় না। সুতরাং তাহা দেবতারও জানিবার সাধ্য নাই। এক্ষণে স্বদেশ সম্বন্ধে সরল ভাবে হিন্দু মাত্রেরই আত্মীয়তার স্মরণ জন্য প্রেমালিঙ্গন করা আবশ্যকীয় হইয়াছে; যে বীধতুল্য সাম্প্রদায়িকতাতে হিন্দু সমাজের স্বর্গীয় সুখ ভঙ্গ করিয়াছে তাহা পুনর্ব্বার সজীব করনার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার আবশ্যক, ইহার নিকট কোন উপরোধেরই মুখাপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। সুশিক্ষিত সমাজকেই কাতরোক্তিতে এই সমস্ত নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে যার পর নাই ক্ষোভের বিষয় হইয়া পড়ে। কোন সময়েই ভারতবর্ষের এমন সামাজিক দুর্গতির সময় সমুপস্থিত হয় নাই, পক্ষান্তরে আর কোন সময়েই ভারতবর্ষীয়দিগের এমন অনুকূল সময়ও আসিবে না। হিন্দুমেলার মূল অভিপ্রায় কি তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, সকলেই পরম প্রোৎসাহে ইহার মূলে এক মুষ্টি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করুন, অচিরে ইহা ফলবতী হইবে, সমাজস্থ সকলেই সেই ফলের অধিকারী হইবেন। ইহা একের জন্য নহে, আপামর সকলেরই তুল্যাধিকার তাহাতে বর্ত্তিবে। বাহ্যত ইহার কার্য্য অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না বটে, কিন্তু এবম্প্রকার কার্য্যের বাহ্য আড়ম্বর নাই। অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় ভিন্ন কোন মহৎ কার্য্যেরই শুভ পরিণাম নাই। যখন এই মেলা পরিণত সময়ে উত্তীর্ণ হইবে, তখনি ইহার বাহ্যাভ্যন্তরের কার্য্য বিলোকন করিয়া সকলেই পুলকিত হইবেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশে ঐ রূপ মেলার সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হইবে, অস্মদেশের আত্মীয়তার বর্দ্ধনও তত দৃঢ়হইবে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেশীয় ভদ্র লোকেরা এতাদৃশ মহা ইষ্টকর জাতীয় বর্দ্ধনে পরম অনুরাগী না হন, তাবত আর্য্য জাতির সে শুভ আশার সম্ভাবনা আছে? বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রোৎসাহে আমরা বিদেশীয় বিদ্যালাভেই কৃতকার্য্য হইতেছি, কিন্তু জাতীয় বিবিধ কল্যাণের

পথ কোথা হইতে মুক্ত হইবে। কোথা হইতেই বা হিন্দুসমাজের কল্যাণ হইবে? বিদেশীয় দিগের হস্তে আমাদের সমাজ সংশোধনের ভার প্রদত্ব হইলে সম্যক ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। উহা বিজাতীয় দিগেরই প্রবৃত্তির অনুগামী হইবে, বিজাতীয় প্রবৃত্তির অনুগমনে জাতীয় শুভ রীতি নীতি বিস্মরণ হইয়া বিজাতীয় দিগের দোষাপকর্ষণে আমাদের পক্ষপাত থাকিবে না। ক্রমে ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির বিজাতীয় আচারাদির অনুকরণে ব্যাসক্ত হইয়া কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবে তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ চিন্তার অতীত। এই রূপেই অনেক প্রাচীন জাতির পতন হইয়াছে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুরা মুসলমান দিগের ন্যায় পারসিক ভাষার পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল না গত হইতেই তাঁহারা মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আর কিছুদিন মুসলমানের আধিপত্য থাকিলে জাতীয় ভাষা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইত। হিন্দুমেলার ইহার বিপরীত অর্থ। জাতীয় উন্নতি এবং গৌরবের গুণানুকীর্ত্তন করাই এই মেলার উদ্দেশ্য; অর্থের সুসার হইলে নানা প্রকার উপায় প্রদর্শন পূর্ব্বক সৎবিষয়ে সমাজের প্রবৃত্তি লওয়ান মেলার অপর একটী কার্য্য, কিন্তু তাহা কোথাহইতে হইবে? সাধারণের স্বদেশের প্রতি যত্ন কোথায়? অনেক ভদ্রলোকেও ইহার প্রতি তত যত্নশীল নহেন। যে কার্য্যে সাধারণ যত্ন-সমপাদ্য দুইএক ব্যক্তির চেষ্টায় তাহা কত হইবে, তবুও নবগোপাল বাবুকে ধন্যবাদ যে, তিনি ন্যাসান্যাল্ সোসাইটী প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় লইয়া এ অবস্থায় ক্লান্ত ও বিভ্রাট গ্রস্ত হন নাই। "আমাদের আপনাদের বিষয় আপনাদিগকে সমাধা করিতে হইবে," তাঁহার অন্তঃকরণে এই উৎসাহ বীজ নিয়ত স্বধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে, এই হেতু এতৎ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলাই বাহুল্য, পরন্তু ভারতবর্ষের উপর আমাদের স্নেহ সীমা বদ্ধ নহে। আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকেই আত্মীয় জ্ঞান করি। সুতরাং এক বন্ধনীর উদ্দেশে দৃষ্টি রাখা শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ হিন্দুমেলার অভিপ্রেত মহৎ, ঋজু বুদ্ধি লোকেরা ইহাকে সংকীর্ণ করিয়া তোলে, কিন্তু ইহা তাহা নয়, হিন্দুমেলার কথা, সমস্ত ভারতবর্ষের কথা। ইহার কথা কেবল বাঙ্গালীর প্রিয় হইবে, এরূপ নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুজাতি ব্যাপিয়া তাহা বর্ত্তিবেক। যখন আমরা হিন্দুমেলা স্থলে উপনীত হই, তখন যেন আমাদের হৃদয়ে এরূপ গর্ব্বের আবির্ভাব হয় যেন আমরা হিন্দুজাতির মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছি, কোঁচ, রাজপুত্র, পল্লিগার মহারাষ্ট্রীয়, প্রভৃতি সকলেই যেন আমাদের বেষ্টন করিয়া আছে।

আমাদের একের মুখ হইতে যেন সকলের প্রতিধ্বনি নির্গত হইতেছে। আমরা যেন বহু জনতা বহু বিদেশীর মধ্যে সমাত্মীয়তায় আকর্ষিত হইয়াছি, ভিন্ন দেশ ভিন্ন প্রদেশ, ভিন্ন শ্রেণী হইলেও আমাদের যেন একই হৃদয় প্রতীত হয়। তীর্থ স্থান ব্যতীত আমাদের আর কোথায়ও এ প্রকার মন প্রীতিদায়ক আত্মীয়ভাব দেখা যায় না। অতএব হিন্দুমেলা দ্বারা তাহা সম্পাদন করা মুখ্য কার্য্য, কিন্তু ক্ষোভের সহিত বলিতে হইল হিন্দু জাতির সে জাতীয় অনুরাগ নাই, কেবল বাঙ্গালি লইয়াই প্রায় মেলাটী কয়েক বৎসর চলিতেছে, ইহাতে সর্ব্ব হিন্দুশ্রেণীর যাহাতে সমভাবে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় তাহার উদ্যোগ হয় না। কেন হয় না? অর্থের অনাটন! আমরা বলিয়া রাখিতেছি, হিন্দু সমাজকে কার্পেটের যাঁক দেখান যদি মেলার অভিপ্রেত হয় তাহাহইলে ঐ রূপই চলুক, আর সামাজিক স্বজাতীয় মঙ্গলের অভিপ্রায় যদ্যপি

থাকে তাহা হইলে হিন্দুমেলাকে সকল শ্রেণীর হিন্দুকে আহ্বান করিয়া আমোদ করিতে উৎসাহিত কর, মেলার অর্থে দশবারজন বিজ্ঞহিন্দু ভারতবর্ষ ভ্রমণ করুন এবং তাঁহাদের ভ্রমণের ফল বাহুল্যরূপে মেলায় সুঘোষিত হউক। যাহারা মেলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে সমাজ তাহাদের প্রতিষ্ঠা করুন। ভিন্ন বিদেশীয় হিন্দু দিগের প্রতি পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিপাত করা হউক। এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে মেলার কোন মতেই উত্তরকালে শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। বৃথা অন্য দিকে ব্যয় না করিয়া এরূপ প্রকার বিষয়ের চেষ্টাকরা বিধেয়।

ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য।

ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রকৃত অভিধান তিরুবঙ্কড়। ইহা দক্ষিণ দেশের এক ক্ষুদ্র প্রদেশ। ইহার উত্তরাংশে কোচিন রাজ্য, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে মহাসমুদ্র, পূর্ব্বভাগে আরণ্যক উচ্চ ভূধরশ্রেণী। ইহার দৈর্ঘ ১৪০ জ্যোতিষী ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় বিংশতি ক্রোশ।

ত্রিবাঙ্কোড় প্রদেশের পর্ব্বত সন্নিহিত স্থান সকল স্বভাবত ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও উপত্যকাও বক্রগতিশীলা নদী দ্বারা পরিকীর্ণ। উহার তোয়রাশি নিরবচ্ছিন্ন শৈল পাদদেশে প্রবাহিত হওয়াতে তথায় প্রচুর শস্যাদি সমুৎপন্ন হয়। তত্রত্য পর্ব্বতমালা বিশাল বন দ্বারা অলঙ্কৃত, তন্মধ্যে লবঙ্গ, এলাইচ, ইত্যাদি নানা প্রকার গন্ধ যুক্ত পদার্থ জন্মিয়া থাকে। পর্ব্বতের নিম্নবর্ত্তী অরণ্যে বৃহদাকার হস্তী, মহিষ, ব্যাঘ্রাদি বিচরণ করে। এবং তথায় নানা জাতীয় বহু সংখ্যক বানর একত্রে বাস করে।

কর্ণাট দেশ অপেক্ষা এতৎ প্রদেশে প্রচুর শস্যোৎপত্তি হয়। ঐস্থানের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং কদাচ শস্যের হানি হয় না। যথেষ্ট শ্রম করিলে কৃষক গণের বিপুল শস্য লব্ধ হয় তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র। পানের উপর গবর্ণমেন্টের একাধিপত্য আছে। নারিকেলও যথেষ্ট জন্মে। তদ্ভিন্ন তুলা, মৌরি, বাহাদুরী কাষ্ঠ প্রভৃতি বাণিজ্যের অনেক প্রকার দ্রব্য এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। তদর্থে রাজস্বের যথেষ্ট আনুকূল্য হয়। ফলতঃ এস্থানে বলা অন্যায় নহে যে ত্রিবাঙ্কোড় প্রদেশের নানা প্রকার বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্য জন্মিয়া থাকে।

ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে খ্রীষ্ট মতাবলম্বী দিগের উৎসব বা পর্ব্বের করগৃহীত হইত। ধীবরদিগের জালের ও মৎসের এবং নায়ের, মোপ্লে, (মুসলমান) ও শিল্পকার ব্যতীত ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম অবধি ষষ্টি বৎসর বয়স্ক লোকের মস্তকের কর গ্রহণের রীতি ছিল, অধুনা ঐ নিয়ম আছে কি না তাহা আমাদের অবগতি নাই। ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য মলাবার দেশের কিয়দংশ মাত্র, সেই হেতু তত্রত্য অধিবাসী দিগের আচার ব্যবহার মলাবার মনুষ্য দিগের সমতুল্য। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে এই প্রদেশে প্রাচীন হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার অপরিবর্ত্তিত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই দেশই কোন কালেই মুসলমান দিগের দাসত্বে বদ্ধ হয় নাই। কিন্তু অধিক দিন হইল খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম উক্ত প্রদেশে সমাগত হইয়াছে। তথায় লক্ষ লোকেরও অধিক ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত। কোন লেখক বলিয়াছেন যে, এক এক স্থানে দেবমন্দিরের এত অল্পতা এবং গির্জা এত অধিক যে ইহা বিদেশীয় ভ্রমণকারীর সহসা ভারতবর্ষনয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। খ্রীষ্টানদের তথাকার

হিন্দুরা মাজারালি মোপিলা বলেন। সুরিএন্ বা সুরিয়ানী সর্ব্বদা বলাহয়। সমুদ্র উপকুলের ধীবর জাতি প্রায় সকলেই খ্রীষ্টীয়ান্।

ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজবংশের জাতীয় বা কৌলিক উপাধি কীর্ত্তিরাম। এবং এই ক্ষুদ্র রাজ্য পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশস্থ মথুরার ভূপালবৃন্দের করদ ছিল, কিন্তু ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১৭৫৫ অব্দ মধ্যে ত্রিবাঙ্কোড়ের মহীপাল দিনেমার দিগকে পরাস্ত করিয়া বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকৃত করেন। কথিত আছে যে, উক্ত নৃপতির অধীনস্থ হউস্‌ষ্টাচিয়স্ ডি লেনয় নামা জনৈক ফ্লেমিশ সৈন্যাধ্যক্ষের ইউরোপীয় সংগ্রামপ্রণালী শিক্ষাগুণে রাজ-সৈন্যেরা সংগ্রামে জয়লাভ করণে সক্ষম হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে টীপুশুলতান্ উক্ত রাজ্য আক্রমণ করাতে ইংরাজ দিগের সহিত ত্রিবাঙ্কোড় নৃপতির মৈত্রেয়িক সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহা নিম্নে বর্ণন করা হইবে, কুমারিকা হইতে রাজধানী ৪৭ জ্যোতিষী ক্রোশ এবং মান্দ্রাজ হইতে ২৩২ ক্রোশ ব্যবহিত। উহার প্রাচীন রাজপাঠ মল্লার নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্বাধীন নৃপতি পরস্পরের রাজ্যাক্রমণ জন্য বিগ্রহাদি প্রজ্বলিত করিয়া উক্ত রাজ্যের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছিলেন, পরন্তু উক্ত শতাব্দের মধ্যেই ত্রিবাঙ্কোড়ের অধীশ্বর স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে উপরোক্ত ভূপাল গণকে এক এক করিয়া প্রায় সকলকেই বশতাপন্ন করিয়া আনিয়াছিলেন। ভোজী ভোলা পিরুমল্ল ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে আধিপত্য করেন; দুঃসাহসিক ফ্লেমিশ সেনাপতি ত্রিবাঙ্কোড়ের অধীশ্বরের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন, তিনি বুদ্ধিমান এবং সংগ্রাম বিষয়ে অতিশয় সুচতুর ছিলেন। তাঁহার সামরিক বুদ্ধি প্রভাবে এবং বীর প্রতাপে পূর্ব্বোক্ত রাজবৃন্দ প্রায় সকলেই ত্রিবাঙ্কোড় রাজার আনুগত্য স্বীকারে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। পিরুমল্লের রাজত্বের অন্তিম দশায় ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রায় সকল নৃপতি যুদ্ধবিগ্রহ এক কালে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হাইদার এবং টীপুর সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের নৃপতি বৃটীশ গবর্ণমেন্টের চির বিশ্বাসী বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তদর্থে১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ দিগের সহিত টীপুর যে সন্ধি হয়, ঐ সন্ধিপত্রে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের নৃপতির নাম স্বাক্ষর করা হইয়াছিল। তজ্জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তিনি পরম বিশ্বাসপাত্র বন্ধু বলিয়া পরিচিত হন।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহীশুরের টীপু শুলতান্ প্রাগুক্ত রাজাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান রাজা ইংরাজ দিগকে এই ব্যাপার পরিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তদীয় রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরাজ দিগের অধীনে কতক গুলি সৈন্য রক্ষার্থ বার্ষিক ব্যয় প্রদানে অধিকারাভিভূত হইয়াছিলেন। পরন্তু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টীপু শুলতান বিদ্বেষ প্রভাবে যথেচ্ছরূপে ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণান্তে তাহা লুণ্ঠিত এবং উক্ত রাজ্যে ভয়ঙ্কর উপদ্রব করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। টীপুর এতাদৃশ স্বেচ্ছা বিলাসিতায় অগত্যা তদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল এবং মৈত্রেয় রাজ্যে উপদ্রব প্রকাশ জন্য সিংহ প্রতাপ বৃটীশ্ গবর্ণমেণ্ট টীপুর সহিত সংগ্রাম করণে প্রণোদিত হইলেন। তদুপলক্ষে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে

টীপুসুল্‌তানের সহিত বৃটীশ্‌ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি-সমাধা হইল, সন্ধির সর্ব্ব প্রারম্ভেই বৃটীশ্‌ গবর্ণমেণ্ট মৈত্রেয় রাজার হৃত রাজ্যের পুনঃ প্রত্যর্পণের জন্য টীপুকে অঙ্গীকৃত করান।

উপরোক্ত সন্ধির পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত মহীপালের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আর এক সন্ধি সমাধা হইয়া ছিল। উক্ত সন্ধির মর্ম্ম এই যে তৎকালে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে প্রচুর মরীচের বাণিজ্য ছিল, তদর্থে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজাকে দশ বৎসর সাংগ্রামিক অস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া দিবার অঙ্গীকার করেন, রাজা তদ্বিনিময়ে উপরোক্ত দশ বৎসরেরনিমিত্ত ইংরাজদিগকে প্রচুর মরীচের সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার করেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কোড়ের অধীশ্বর প্রয়োজনানুসারে অধিক সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আরও কতিপয় দল সৈন্য এবং তোপ নিয়োগের জন্য অপর নূতন এক সন্ধি সংস্থাপন করেন, এবং তদীয় উত্তরাধিকারী ও অতিরিক্ত সৈন্য নিয়োগের জন্য আর এক সন্ধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তদর্থে তিনি এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, যে রাজ্যের আয় বিবেচনানুসারে উক্ত সৈন্যের ব্যয় প্রদান করা হইবে, এবং রাজা স্বয়ং তৎপ্রদান করিতে অক্ষম হইলে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং রাজস্বের কার্য্য নিষ্পাদন পূর্ব্বক সৈনিক ব্যয়ের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অপর কোন বিদেশীয় রাজার সহিত তিনি কোন পরামর্শ করিতে পারিবেন না এবং স্বীয় অধিকার মধ্যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে ইউরোপীয় কোন কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। ঐ সমস্ত সন্ধির অঙ্গীকার প্রতিপালনার্থ রাজা বৃটীশ্‌ গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৮,০০,০০০ অষ্ট লক্ষ মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভৌজীভৌলা পিরুমল্লের পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে রাজা রামবর্ম্ম পিরুসল্ল কীর্ত্তিবাস সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহার আধিপত্য কালে ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজকীয় কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কোড়ে একরাজবিদ্রোহিতা ঘটে, কিন্তু বৃটীশ্‌ সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া দিয়াছিল। রাজা বৃটীশ্‌ গবর্ণমেণ্টকে যে বার্ষিক টাকা প্রদানে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা যথারীতি প্রদান না করাতে বৃটীশ্‌ গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থ আদায়ের জন্য ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের রাজকীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সংকল্প করিয়া ছিলেন, কিন্তু তৎকালে রাজা রামবর্ম্ম পিরুমল্লের পরলোক প্রাপ্তি নিবন্ধন ইংরাজেরা তৎসাধনে বিরত হন।

তৎপরে রাজ্ঞী লক্ষ্মী এবং তৎসাহায্যার্থ বৃটীশ রেসিডেণ্ট কর্ণেল মন্‌রোর দ্বারা রাজকীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ়া থাকেন, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীরাণীর ভগিনী তৎকালে বৃটীশ রেসিডেণ্টের পরামর্শে শিশু রাজ কুমারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত রাজকীয় কার্য্য উত্তমরূপে সুসম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীঃ শিশু রাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনাধিরূঢ় করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয় ভ্রাতা রাজা মার্ত্তণ্ড বর্ম্ম আসনাধিষ্ঠিত হন। ১৮৬০ খ্রীষ্টব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। এবং তাঁহার ভাগিনেয় রামবর্ম্ম রাজা হন, তেঁহ দত্তক গ্রহণানুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণদেশের নায়ের শূদ্রজাতির পৈতৃক

বিভব প্রাপ্তি কোন মুনির ব্যবস্থানুসারে স্ত্রী সম্বন্ধে বর্ত্তে। যথা কোন রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় সন্তান পিতৃ রাজ্য প্রাপ্ত হন না, সহোদরে তাহা বর্ত্তে। তদন্যথায় ভগিনীর পুত্র কিম্বা কন্যাতে দায় প্রাপ্তির সম্বন্ধ হয়।

ত্রিবাঙ্কোড়ের পরিধি ৬৬৫৩ চতুরস্র ক্রোশ। অধিবাসী প্রায় ১২৬২৬৪৭ লোক। রাজকীয় আয় ৪২৮৫০০০। রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ১৬৮০ পদাতিক। ত্রিশজন তোপকারী, চারিটা কামান আছে।

বুদ্ধের বৃত্তান্ত।

পাঠকগণ ষট্‌পদের ন্যায় পিযূষ লোভী, পুষ্পে পুষ্পে পরিভ্রমণ করাই তাঁহাদিগের স্বাভাবিক অভ্যাস, তাঁহাদিগের সে অভ্যাসের বিরোধী হইলে তৎসমীপে আমাদিগকে অপরাধী হইতে হয়। পক্ষান্তরে ভগবান্‌ স্বয়ং ব্রহ্ম ভূভার হরণ জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া ক্ষত্রীয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, বেদের নিন্দা করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ছিলেন ইত্যাদি পৌরাণিক বাক্যে আমাদের বিশ্বাস না থাকিলেও সজ্জন পাঠক গণের পরিতোষের নিমিত্ত এবম্প্রকার বিষয়ে উপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য। শুদ্ধ তদনুরোধে বুদ্ধেরবৃত্তান্ত লিখিতে আমরা প্রণোদিত হইলাম।

বিদেশীয়েরা একশত বৎসর মাত্র সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন হইয়াছেন, তৎপূর্ব্বে ভিন্ন দেশের প্রায় সকল লোকে সংস্কৃত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সেইহেতু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত শাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থের মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য কোন ক্রমেই কেহ বুঝিতে পারিতেন না। প্রসিদ্ধ আকবার শাহ ছদ্মবেশে ফৈজি নামা মুসলমান সন্তানকে সংস্কৃত শিক্ষা করাইয়া ছিলেন, কিন্তু তৎপরে এই গরীয়সী সুপবিত্র ভাষা কোন বিদেশীয়ের কণ্ঠস্পর্শ হয় নাই। অধুনা ইউরোপের মহা প্রযত্নবান পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে সম্যক প্রবেশের নিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের লিখিত বিষয় কদাচ প্রমাদশূন্য হয়। এক জন লিখিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় লোকদিগের বৌদ্ধই প্রাচীন ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু এমতের প্রতিবাদ করিবার এদেশে প্রায় অল্প লোকই আছে, যে হেতু ভারত বর্ষে বেদ ব্যতীত প্রাচীন কোন ধর্ম্মই ছিল না। বিজাতীয় লোকেরা উহার প্রতিবাদ করিলে কে তাহার উত্তর প্রদান করিবে। যাহা হউক আমাদের এতদ্দেশে যে সময়ে দর্শন শাস্ত্রের সম্যক চর্চ্চা হইয়া ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম সেই সময়েই উদ্ভূত হয় তাহার কোন সন্দেহই নাই। এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, কাপিল সূত্র হইতে বৌদ্ধ সত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশীয়গণ একটা আবশ্যকীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধানে বিশেষ তাচ্ছল্য করাতে আমরা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে অনায়াসেই এমন অভিজ্ঞান জন্মে যে উক্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য দ্বীপ এবং দেশাদিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ইউরোপের মধ্যেও এই খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর হইয়াছে অনুমান হয়। সত্য অনুসন্ধানপ্রিয় প্রাচীন প্রাচীন তত্ত্ব সমালোচক ধীরাগ্রগণ্য লোকেরা এতদ্বিষয়ে আগ্রহ সহকারে পরিশ্রম বিনিয়োগ করিলে প্রকৃততত্ত্ব অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারেন। সত্যের অনুসন্ধানে নিন্দা নাই, লজ্জাও নাই।

এতদ্বিষয়ে আমাদের যে রূপ দৃঢ় হৃদয়ঙ্গম আছে, তাহাতে আমরা স্পষ্টই বলিতে পারি যে, উক্ত উভয় ধর্ম্ম স্বতন্ত্র মূলক হইলেও সাদৃশ্য এক উপলব্ধ হয়। আমরা এতৎ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসের হেতু ক্রমে প্রদর্শন করিব। এস্থলে প্রকৃত প্রসঙ্গে লেখনী সঞ্চালিত করা বিধেয় হইতেছে।

বিদেশীয়দিগের লিপি প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের জন্ম হয়, এবং প্রথম খ্রীষ্টাব্দে এতদ্দেশ হইতে বৌদ্ধ মতাক্রান্ত লোকেরা বিদূরিত হয়। এই ছয় শত বৎসর, ভারতবর্ষে বৌদ্ধরা আর্য্য জাতির উপর নানা প্রকার অত্যাচার করে, এবং ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রে বৌদ্ধাধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, এস্থলে পাঠক বর্গের স্মর্ত্তব্য যে এই প্রবল গৃহ শত্রু ও অপর বিদেশীয় মুসলমানদিগের উপদ্রবে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য কতকাল তিষ্ঠিতে পায়ে? এতদ্দেশের সাম্প্রদায়িকতার কাল বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের সময় হইতে প্রারম্ভ হইয়াছে, ঐ সময়ে আর্য্য জাতির ধর্ম্ম বন্ধন শিথিল হইয়া যায় বৌদ্ধেরা আর্য্যদিগের যজ্ঞকুণ্ড ধ্বংস, অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিতে লাগিল, ধর্ম্মের প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধা বশতঃ তাঁহারা নির্জ্জন আবাসে যজ্ঞের পরিবর্ত্তে পূজা দেবার্চ্চনার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, বনে তপস্যা করা প্রায় লোপ হইতে লাগিল। আর্য্য জাতির ধর্ম্ম বুদ্ধিও ক্রমে সঙ্কোচ হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। পূর্ব্বে বোধ হয়, আর্য্যদিগের হোম, যজ্ঞ, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমবেত হইয়া সম্পন্ন করিবার বিশেষ নিয়ম ছিল, এবং গবাদি ভক্ষণ আর্য্যদিগের প্রতিষেধ বিধি ছিল না, বৌদ্ধ রাজাদিগের কঠোর শাসনেই গোমাংস প্রতিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যদিগের রীতি হইতে হিন্দুদিগের যে স্খলন হইয়াছিল, তাহা বৌদ্ধ সাম্রাজ্য কালেই সংঘটিত হইয়াছিল এরূপ আমরা অনুমান করিতে পারি।

প্রকৃত জীবন চরিত অভাবে এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবন বৃত্তান্ত নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, ইহা আমরা পূর্ব্ব খণ্ডে বররুচির প্রসঙ্গে বলিয়াছি। কিন্তু জনৈক বিদেশীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, যে বৌদ্ধদেব মহাপতি নামা ভূপালের ঔরসে চন্দ্রানাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শাক্যসিংহ বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম সুদোদন এবং জননীর নাম মায়াদেবী। এই সুদোদন ভূপাল নৃপতি পুত্র কামনায় মহা তপস্যা যাগ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতেই শাক্য সিংহ তদীয় ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ঔদাসিন্য, তপস্যা, কঠোরতা, যোগ, ধ্যান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি বুদ্ধের প্রধান ধর্ম্ম ব্যবস্থা ছিল, তিনি নিজেও সংসারাশ্রম ত্যাগী উদাসীন ছিলেন। যোগাভ্যাস বা ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহে যাঁহারা সিদ্ধকাম হইতেন, বৌদ্ধেরা তাহাদিগকে দেবযোনী বলিয়া মান্য ও উপাসনা করিতেন।

একদা ভারতবর্ষে অতুল বৌদ্ধ প্রতাপ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, মনে করুন্ এই বিশাল ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই বৌদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এবং তাহারা আর্য্যগণের যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়াও ছিল। ভারতবর্ষে আর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রায় লোপ হইবার উপক্রম হইয়া ছিল। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ধুরন্ধর নামা নৃপতি শেষ বৌদ্ধ ভূপাল আদিত্যপালকে নিহত করিয়া আর্য্য ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করেন।

যাতক নামক বৌদ্ধধর্ম্ম সংহিতায় বৌদ্ধের আরও বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধদেব কাশীর অধীশ্বরের একমাত্র তনয় ছিলেন। যে সময়ে

তাঁহার জননী গর্ভবতী হন, সেই সময়ে নানা প্রকার ভবিষ্যৎ বাক্য এবং নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, বুদ্ধের ষোড়শ শত ভার্য্যা ছিল।

বুদ্ধের জননী চন্দ্রাবতী কোন প্রসিদ্ধ রাজ দুহিতা ছিলেন। ঐ পুণ্য তমা রাজ মহিষী নিরতিশয় ধর্ম্মশীলা এবং সুশীলা ছিলেন। সেই হেতু কোন মহাপ্রভাব সিদ্ধ তদীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। এবং পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের অঙ্গীকার করেন। এই সিদ্ধের নাম বুদ্ধিস্বত। তিনি দুইবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। একবার কাশীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ২০ বৎসর রাজত্ব করেন! ঐ জন্মে অশীতি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যায় কালাতিপাত করেন, তৎপরে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে তবতিংশয়স্থানে জন্মিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে নানা বিধ সৎকার্য্য করণানন্তর দেবলোকে গমন করেন। তৎপরে দেবতারা তাঁহাকে মর্ত্ত্যে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণের আদেশ করিলে বুদ্ধদেব পাঁচশত দেব কুমারের সহিত কাশীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে কাশীতে আর কাহার পুত্র জন্মিল তাহা জানিবার নিমিত্ত রাজা নানা স্থানে দূত প্রেরণ করিয়া জ্ঞাত হইলেন পাঁচ শত শ্রেষ্ঠীর গৃহে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, রাজপুত্র ঐ পাঁচশত শ্রেষ্ঠীর দ্বারা রক্ষিত হইবে ভাবিয়া রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। পরে ঐ সকল সন্তানের রক্ষার জন্য ধাত্রী নিয়োজিত করিয়া দিলেন। এবং বুদ্ধের প্রতিপালনার্থ দুইশত চত্বারিংশৎ জন দাসী নিযুক্ত করিলেন। ঐ সকল ধাত্রী রূপে গুণে কুলে শীলে অতিমান্যা ছিল। অন্নপ্রাশন দিবসে পণ্ডিতেরা রাজ পুত্রের শরীরে নানা সুলক্ষণ দর্শনে রাজাকে কহিলেন। রাজপুত্র অতি বিশুদ্ধ স্বভাব এবং মহা গৌরবান্বিত হইবেন। তৎকালে তাঁহার নাম তিমি রাখাহয়।

একমাসকাল গতে শিশু কুমারকে রাজার ক্রোড়ে অর্পিত হইল। ঐ সময়ে চারিজন অপরাধীকে রাজ সমক্ষে ধৃত করিয়া আনয়ন করা হইল। রাজা তাহাদিগকে অতিশয় দণ্ড প্রদান করিবার আদেশ করিলেন। তৎপরদিনে কুমারকে পুনশ্চ রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করা হইলে তিনি রাজপুত্র বুঝিতে পারিয়া পিতার উদ্ধার জন্য নিতান্ত চিন্তিত হন। যে হেতু পূর্ব্বদিনে রাজা অপরাধীগণের যে দণ্ড করিয়া ছিলেন বুদ্ধের মন তাহাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার বিশেষ কারণ এই যে তিনি পূর্ব্ব জন্মে রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন পুনশ্চ পিতৃ রাজত্বে অধিরূঢ় হইয়া অপরাধিদিগকে দণ্ড দিতে হইবে, সেই ভাবনায় তাঁহার কলেবর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গেল। অহিংসাই তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের মূল। কিন্তু রাজা হইয়া কত অহিতাচরণ করিতে হইবে, এই চিন্তাই অধিক হইল। তাঁহার জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবী ঐ সময়ে প্রত্যক্ষ ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন বাপু তুমি অন্ধ, বধীর এবং খঞ্জের ভান করিয়া থাকিলে তোমার রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে হইবে না। তাহা হইলেই তুমি উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তৎকাল অবধি পাঁচশত বালক ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলে রোদন করিত, বুদ্ধদেব সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিলেও মৌন হইয়া থাকিতেন। রাজ্ঞী চন্দ্রাবতী দাসীদের ঔদাসীন্য দেখিলেই স্বয়ং স্তনপান করাইতেন, কিন্তু কুমারের অভিসন্ধি তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেন নাই। তাহার জননী দেবকন্যা তাঁহাকে বধীর, হইতে আদেশ

করিয়া গিয়াছিলেন সেই জন্য বুদ্ধদেব রোদন করিতেন না।

বুদ্ধের জন্ম অতি আশ্চর্য্য, এবং ভবিষ্যতে তিনি অসাধারণ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবেন জ্ঞানী লোকেরা এমন ভবিষ্যদ্বাক্যও বলিয়াছিলেন। সেই হেতু বুদ্ধের বাকশক্তির হীনতা ও জড়তা দর্শনে রাজার মনে কোন সংশয়ের উদয় হয় নাই। কেন না বুদ্ধ ভবিষ্যতে যে এক অলৌকিক ক্ষমতাশালী লোক হইবেন তাহা তিনি জানিতেন, তিনি ভাবিয়া ছিলেন, নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক উপায় বিধান করিলেই জড়তা দূরীকৃত হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ব্যর্থ হইল। বুদ্ধের এক বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বিবিধ মিষ্টান্ন, দ্বিতীয় বৎসরে উপাদেয় ফল, তৃতীয় বৎসরে ক্রীড়াপ্রদ দ্রব্য, চতুর্থ বৎসরে নানা প্রকার ভোজ্য উপচার প্রভৃতির প্রলোভনেও তাঁহার জড়তা দূরীভূত হইলনা দেখিয়া তিন বৎসর অগ্নি, হস্তী এবং সর্পের ভয় প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় ব্যর্থ হইল। তৎপরে নৃত্য গীত, তৎপরে চারি বৎসর শঙ্কা প্রদর্শনেও কোন ফল দর্শিল না।

পরিশেষে অনুপায় ভাবিয়া তিন বৎসর কঠিন রূপে পীড়নারম্ভ করা হইল। কঠোর যন্ত্রণাতেও বুদ্ধের জড়তা দূর না হওয়ায় সকলেই বিবেচনা করিল, আর এ যুবা কোন ক্রমে স্বাভাবিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু তৎকালে ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়াতে সহজেই কামিনীগণের প্রেমাসক্তির আবির্ভাব হইবে স্থির করিয়া বুদ্ধকে রমণী মণ্ডলে এক বৎসর রাখা হইল, কিন্তু বুদ্ধের তাহাতেও জড়তা দূর হইল না। পরিশেষে অমাত্যেরা রাজাকে বলিল, এসন্তান কে ভূতলে প্রোথিত না করিলে রাজ্যের মহা অমঙ্গল ঘটিবেক। অতএব এই দণ্ডেই অনুমতি করুন আমরা রাজ পুত্রকে ভূমি মধ্যে প্রোথিত করি।

রাজা অবিলম্বেই পুত্রের বিনাশার্থ পশ্চিম দ্বারের প্রান্ত স্থিত বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্র রজ্ঞী অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া রাজার সমীপে উপনীতা হইয়া সকাতরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত, বারম্বার রাজ অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজা নিরিন্দ্রিয়, জড়স্বভাব পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপনে অসম্মত হওয়াতে রাজ্ঞী পুনশ্চ সপ্ত বৎসরের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজা সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সাত দিবস বুদ্ধকে রাজ্ঞীর অনুরোধে রাজ্য সিংহাসন দানে সম্মত হইলেন। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু পরায়ণ প্রহ্লাদের যে আশ্চর্য্য ধর্ম্মশীলতা পুরাণের মধ্যে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক সত্য নহে বলিলে অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিবেন, কিন্তু প্রহ্লাদ চরিত্র এই বৌদ্ধ চরিতের রূপান্তর বিবেচনা হয়। কোন ষণ্ডামার্ক এই বৌদ্ধ উপাখ্যান ভাঙ্গিয়া নরসিংহের মূর্ত্তি গঠন করিয়া থাকিবেন সংশয় মাত্র নাই।

শুভ দিনে শুভ লগ্নে মহা সমারোহে বুদ্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। পুত্রবৎসলা রাজমহিষী পুত্রের মৌন স্বভাব এবং জড়তা বিনাশের জন্য বহু দেবারাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের সময় সম্পদ লোভী বন্ধুর ন্যায় দেবতারাও অদৃশ্য হন। রাজ্ঞীর কাতর স্তুতি কোন দেবতারই কর্ণগোচর হইল না। সপ্তাহ অতীত হইলে রাজা অমনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন এবং বুদ্ধের প্রাণ নাশের নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন। রাজার আদেশ প্রাপ্তি মাত্র অনুচরগণ বুদ্ধকে রথারোহণ

পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন, পথে দেবতারা দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা সারথিকে পথ ভুলাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সারথি স্বয়ং দেবচক্রে পড়িয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া যাত্রা না করিয়া পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইল এবং বিংশতি জ্যোতিষী ক্রোশ দূরে গিয়া এক অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিল, ঐ অরণ্য স্থলে সকলেই রহস্যে বলাবলি করিতে লাগিল, উপযুক্ত বধ্য ভূমি হইয়াছে, আর পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? এই স্থলেই কর্ম্ম সমাপ্ত করা যাউক। ঐ সময়ে অকস্মাৎ বৌদ্ধদেব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং পথে যে সকল দেবতার সহিত দেখা হইয়াছিল, তাঁহারাও আসিয়া উপনীত হইলেন। বধ্য স্থলে জনতার আর সীমা রহিল না, সারথি ভাবিল এ ব্যক্তিটে কে চিনিতে পারিতেছি না, কিন্তু এমন মহাত্মার পরিচয় না লওয়াও অনুচিত হচ্চে। মৌন স্বভাব, বধিরতা, খঞ্জতা, অন্ধতা হঠাৎ দূর হওয়াতে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বুদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্বয়ং আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন সারথি সন্তুষ্ট হইয়া রথ ফেরাইয়া লইয়া গেল।

সারথি বারানসীতে প্রত্যাগমন করিয়া বুদ্ধের অলৌকিক দেবত্বের সংবাদ প্রদান করাতে দেবভাগ্য সন্তানের সহিত আলাপ করণার্থ রাজার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। প্রায় চত্বারিংশৎ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজা বারানসী হইতে যাত্রা করিলেন। সুতরাং রাজার ছত্রদণ্ড প্রভৃতি সকলি সঙ্গে চলিল। দেবতারা ইতিমধ্যে বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া তিন দিনে বুদ্ধের অপূর্ব্ব তপস্যাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বুদ্ধ তাহারি মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে নদী, নির্ঝর, কোন স্থলে সুরম্য তড়াগ, কোন স্থানে মনোহর ফল পুষ্পে শোভিত লতা গহন, কোন স্থানে শুভ্র শৈকতময় বিশ্রাম বর্ত্ম্য, কোন স্থানে বা শ্রবণ মধুর পক্ষী বিরাজিত কানন সৃষ্টি করিলেন। বুদ্ধ বল্কল এবং ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক তথায় তপস্যা করিতে লাগিলেন, সায়ংকালে তপস্বী জনোচিত কিঞ্চিৎ ফল মূল আহার করিয়া পুনশ্চ ধ্যানস্থ হইলেন।

রাজা বুদ্ধাশ্রমে উপনীত হইয়া পরম পুলকিত মনে সন্তানের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষ জন্য পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ে কোন কথার উত্থাপন করিলেন না, কিন্তু বুদ্ধের সদ্বক্তৃতায় রাজারও মন বিমোহিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাজাও সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুচর বর্গের সহিত এক কালেই উদাসীন বেশ পরিগ্রহ করিয়া অরণ্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে বুদ্ধের পিতা রাজ্য ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে তপস্যারম্ভ করিলেন, ঐ সময়ে কাশীর নিকটবর্ত্তী অন্য কোন রাজা কাশীর রাজপাট আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও বুদ্ধের অলৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অরণ্যে যাত্রা করত বুদ্ধের উপদেশে বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। অন্যান্য রাজা গণ ঐ রূপ বৈরাগ্য গ্রহণ করাতে পরম অনুপম বারানসীর রাজসিংহাসন শূন্য রহিল।

গল্পের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে যে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সময়ে রাজাদিগের হস্তী-রথ অশ্ব এবং অর্থ বিভব সকলি বিনষ্ট হইয়া ছিল এবং বুদ্ধের সহিত অরণ্যে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম।

বুদ্ধ তপস্যা বলে যখন পূর্ণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত

হয়েন, তখন তিনি শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কিন্তু চরাচর সকল বস্তু ধ্বংস হইয়া থাকে। আদি পিতা মাতা কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হন নাই। মৃত্যুর পরেও তাঁহাদিগের কিছুই ছিল না, প্রাণীমাত্রেই এক পদার্থ কিন্তু আকৃতি ও স্বভাবের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা মাত্র আছে। এক জাতীয় ধাতু হইতে যেরূপ সিংহ, নর, অশ্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী গঠিত হয়, এবং উক্ত ধাতুময় পশু অনল স্পর্শে যেরূপ আর প্রাণী বিশেষের লক্ষণ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ যে কোন প্রাণী হউক মৃত্যুর পর সকল জীবের আত্মা এক হইয়া যায়। পুনশ্চ চেতন ও জড়পদার্থের কোন ভিন্নতা নাই। শূন্যতাই জগতের পরিশুদ্ধ অবস্থা। ইহা পরিবর্ত্তনশীল নহে। ইহা সর্ব্বক্ষণ সম অবস্থায় অবস্থিত। শূন্য অবস্থায় পুণ্য পাপ বা চেতনাদি কিছুই নাই। কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকা, অভিলাষ ত্যাগ করা এবং জ্ঞান ও বাসনা হইতে আত্মাকে মুক্ত করাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার উপদেশ।

ইন্দ্রিয় দমন এবং যোগাভ্যাস ব্যতীত সেই পরিশুদ্ধ, শূন্য, সুখাবস্থা লাভ হয় না। উক্ত সুখাবস্থা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টাশূন্য, ক্রিয়াশূন্য হওয়া আবশ্যক। কিছু না করিলেই বিশুদ্ধ অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সেই হেতু মোক্ষার্থীরা কোন কার্য্যই করিবেকনা, কোন বিষয়েরই অভিলাষ করিবেক না, কোন বিষয়েই চিত্তকে কাতর হইতে দিবে না। যে জড় পদার্থ হইতে শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে, জড়ের ন্যায় ইহা চেষ্টা শূন্য, চিন্তা শূন্য হওয়াই পরম মোক্ষ। সেই অচেতন জড়ের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্মার পাপ ও পুণ্যের পুরস্কার ও দণ্ডের কোন সম্বন্ধ থাকে না। অনস্থায়িত্বই প্রকৃত সুখ ও পরম মোক্ষ। মনুষ্য প্রস্তর মৃত্তিকার ন্যায় যত জড় ভাবাপন্ন হইতে থাকে, ততই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের মতে কার্য্যে ব্যাসক্ত না থাকাই পুণ্য এবং কর্ম্মে ইন্দ্রিয়াদির বিনিয়োগেই পাপের আধিক্য হইয়া থাকে।

বৌদ্ধেরা বলেন, চরাচর সকল বস্তু আপনা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপত্তি বা সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই। সৃষ্টির উপাদান সকল নিত্য, মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীবোৎপত্তি স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে, এবং স্বভাবের ইচ্ছাতেই উহার বিনাশ হয়। সৎ এবং অসৎ কার্য্য দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি এবং পতন হয়। শুভকর্ম্মে মনুষ্যের সুখোৎপত্তি হয় ও অপকর্ম্মেই তাহার বিনাশ হয়। বৌদ্ধেরা কতকগুলি সিদ্ধলোক মান্য করে, তন্মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

বৌদ্ধ কল্পে চারি জন দেবতা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর এক দেবতার আবির্ভাব হইবে। ঐ দেবতাগণের প্রত্যেকের ষাইট কোটী সিদ্ধ পুরুষ অনুসঙ্গী আছেন, কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে কেবল ২৪ সহস্রমাত্র সিদ্ধ পুরুষ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগণের মতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও দণ্ডনীয় অবস্থা নরক, তদপেক্ষা পশ্বাবস্থা, মনুষ্য জন্ম কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত পরীক্ষার্হ আর কোন জীব নাই। তদপেক্ষা দেবযোনী শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য জন্ম হইতেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বুদ্ধেরা বলে চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ স্বর্গ আছে, ঐ সকল স্বর্গ কল্পান্তরে ধ্বংস হয় না। উহার

নিম্নে দ্বাদশ প্রকার নিকৃষ্ট স্বর্গ আছে, তন্নিম্নে পৃথিবী অবস্থিতি করে, তৎপরে নাগলোক, তৎপরে দ্বাত্রিংশৎ নরক আছে, উহার অধোভাগে ১২০ এক শত বিংশতি টা মধ্য নরক আছে।

মানবগণ তপস্যাবলে যখন সম্পূর্ণ শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা সর্ব্বত্র অনায়াসেভ্রমণ করিতে পারে এবং আপনার দেহ দৃশ্য ও অদৃশ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে, যোগাভ্যাসে ক্রমে মনুষ্যের আত্মা বুদ্ধে লীন হইয়া যায়। বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে তাহাদেরও নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়।

নিশ্চেষ্টা, নিষ্কামনা, নিরিন্দ্রিয়তা বুদ্ধধর্ম্মে পবিত্রতা লাভের সোপান, নির্ব্বাণ লাভ মোক্ষ। তদর্থে তাহাদের একটা প্রসিদ্ধ নীতিপ্রবাদ আছে। ধাবন অপেক্ষা ভ্রমণ করা ভাল, ভ্রমণ করা অপেক্ষা একস্থানে স্থিতিকরা ভাল, স্থিতি করা অপেক্ষা, শয়নকরা ভাল, জাগরিত থাকা অপেক্ষা নিদ্রাভাল, নিদ্রা অপেক্ষা মৃত্যুভাল" !!!

সিংহলের কোন বৌদ্ধ পুরোহিতকে কোন খ্রীষ্টীয় পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, কল্পের শেষে বুদ্ধের কি অবস্থা ঘটিবে। পুরোহিত বলিয়াছিলেন। কল্পের শেষে বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, সাহেব পুনর্ব্বার বলিলেন আপনারা নির্ব্বাণ কাহাকে বলেন, পুরোহিত একটী সেজ জ্বালিয়া তাহা নির্ব্বাণ করত সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ইহাকেই নির্ব্বাণ বলে।"

বৌদ্ধেরা বিবিধ প্রকার মন্দির নির্ম্মাণ করে, তন্মধ্যে মণ্ডলাকার মন্দির প্রসিদ্ধ ও উন্নত স্থানে তাহা নির্ম্মাণ করা হয় এবং তদুপরি ক্ষুদ্র ঘণ্টাসকল সন্নিবেশিত করা হয়। মন্দিরের পার্শ্বে বৃহৎ ঘণ্টা টাঙ্গান থাকে। ঐ সকল মন্দির মধ্যে তিন সহস্র লোক অনায়াসে বসিতে পারে। হিন্দুদের ন্যায় বোদ্ধেরাও প্রতিদিন বুদ্ধ দেবের মন্দিরে পুষ্প, গন্ধ, তণ্ডুল, পান উৎসর্গ করে। মন্দির গুলি বিহিত যত্নে পরিস্কৃত রাখা হয়। এবং তথায় দিবা রাত্রি প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। বুদ্ধের দশ আজ্ঞা পুরোহিতেরা প্রত্যহ সকলকে শুনাইয়া থাকেন। ঐ দশ আজ্ঞা বাইবলের দশ আজ্ঞার অনুরূপ। রোমান মঙ্কদিগের ন্যায় বৌদ্ধ পুরোহিতেরা দার গ্রহণ করেন না। ধর্ম্ম পরায়ণ বৌদ্ধেরা নৃত্য, সঙ্গীত, উৎসব, বাদ্য, সৌগন্ধ প্রভৃতি দ্বারা কদাচ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করেন না। তাহারা কখন কখন ক্ষুধার্ত্ত এবং দুর্ব্বল ব্যাঘ্রদিগের প্রীত্যর্থে শরীর পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া থাকে। মন্দির নির্ম্মাণ অবধি তাহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিবসে মহা জনতা এবং সমারোহ হয়। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধের মূর্ত্তী স্থাপিত থাকে। পীতবর্ণ বস্ত্র বৌদ্ধদিগের পবিত্র বসন। খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে যে রূপ ভবিষ্যদ্বক্তাগণ পূর্ব্বঘোষণা করিয়াছিলেন, জীবনাকর নামা কোন সিদ্ধও সেই রূপ বৌদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়াছিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা খ্রীষ্ট পুরোহিতদিগের ন্যায় নানা কঠোর ব্রতাদি পালন করিতেন। খ্রীষ্টীয় মঠধারিণীদিগের ন্যায় বৌদ্ধদিগের অবিবাহিতা নারীগণ সন্ন্যাসাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা নিতান্ত উদাসীন ভাবে ব্রত পালন করিয়া থাকেন।

খ্রীষ্টান পুরোহিতদিগের ন্যায় ইহারা অবৈতনিক রূপে বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন। বৌদ্ধ সন্তানদিগের বিদ্যারম্ভ কালে মহা ভোজের ব্যাপার হয়। তাহা তিন চারি দিবস থাকে। খ্রীষ্টান পুরোহিতদিগের ন্যায় বৌদ্ধ পুরোহিতেরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টানদের মঠের যেরূপ কতকগুলি বিশেষ নিয়মাবলী

আছে, বৌদ্ধদের ও সেই প্রকার কতিপয় প্রতিজ্ঞা না করিলে কেহ পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইতে পারেনা।

নেত্রাময়।

কথিত আছে যে, মিথিলা রাজ্যের অধিপতি জনক রাজা ভগবান্ সূর্য্যদেবের পূজা এবং তদীয় উপাসনা না করাতে তিনি চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু উপবাস এবং সূর্য্যের বহু আরাধনা দ্বারা তিনি উপরোক্ত পীড়া হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং চরাচরের দীপ্তি-প্রদাতা ভগবান্ তিগ্মরশ্মী জনক-রাজাকে চক্ষু রোগ শান্তির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে মহর্ষি জনক-রাজা চক্ষুরোগ সম্বন্ধে "শলাকাতন্ত্র" নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন, সমুদ্রের ন্যায় তাহা বিস্তীর্ণ।

আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ৭৬ ছিয়াত্তর প্রকার চক্ষুরোগ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বায়ু সঞ্জাত চক্ষুরোগ দশ প্রকার, দশ প্রকার পিত্তভূত, ১৩ কফাত্মক, ২৫ প্রকার পীড়া তিনপ্রকার বিকৃত ধাতু জন্য, ১৬ প্রকার শোণিত জন্য, এবং দুই প্রকার বাহ্য পীড়া প্রযুক্ত জন্মে। উপরোক্ত ৭৬ পীড়ারও আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে, অর্থাৎ ৯ প্রকার চক্ষের গ্রন্থি সম্বন্ধে ২১ প্রকার চক্ষের পত্র সম্বন্ধে, ১০ দশ প্রকার অক্ষির শ্বেতক্ষেত্র সম্বন্ধীয়, গোলাকার কৃষ্ণচক্র সম্বন্ধে চারি প্রকার। ১৭ প্রকার চক্ষের সাধারণ স্থল সম্বন্ধে, ১২ প্রকার দৃষ্টিবিন্দু সম্বন্ধে, বাহ্যাঘাত জন্য দুই প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়।

আর্য্যেরা চক্ষের প্রকৃত অবয়বের নিরূপণ করিয়া পঞ্চ ভৌতিক পদার্থের কাহা হইতে কোন্ দ্রব্যোৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে মেদ, তেজ হইতে শোণিত, বায়ু হইতে কৃষ্ণবর্ণ চক্র, জল হইতে শ্বেতবর্ণ ক্ষেত্র, এবং আকাশ হইতে বাষ্প নির্গম স্রোতপথ হইয়াছে। অক্ষিপত্র দৃষ্টিগোলকের আবরণ। ঐ গোলকের এক একটী আবরণ এক একটী বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধক। প্রথমাবরণকে আর্য্যেরা "তেজ জল" এবং বিদেশীয়েরা উহাকে ভিট্রিয়স্ হিউমার বলেন। এই তেজ জল ব্যতীত ইহার আর কোন উৎকৃষ্ট প্রতিশব্দ অর্থোপযোগী হইতে পারে না। কাচ জলও বলা যাইতে পারে। যেহেতু ইহা দ্বারা দর্শন জ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয় মেদ দ্বারা বেষ্টিত, তৃতীয় বশা দ্বারা, চতুর্থ অস্থি দ্বারা, অক্ষি পত্রাগ্রের লোম, তৎপরে অক্ষিপত্র, পরে চক্ষের তারা, তৎপরে পুত্তলিকা ইত্যাদি পঞ্চ স্থানকে আর্য্যেরা পঞ্চ চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং ঐ পঞ্চ স্থলে পঞ্চ প্রকার বন্ধনি আছে। চক্ষের অন্তর্বাহিনী প্রণালী হইতে নানা ধাতু আনয়ন করত পীড়া উপস্থিত করে। আর্য্যদিগের মতে নেত্রাময়োৎপত্তির এই গুলি প্রধান হেতু। অত্যন্ত উষ্ণ দেহে অবগাহন, অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ অতিশয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক সন্দর্শন, কিম্বা দূরের সূক্ষ্ম পদার্থ যত্নে দৃষ্টিকরণ, কিম্বা অব্যবস্থিত নিদ্রা, নিয়ত রোদন, শোক, ক্রোধ, বাহ্যব্যথা প্রাপ্তি, অতি রমণ, অম্লদ্রব্য ভক্ষণ, মাস কলাই ভোজন, চক্ষে শোকাশ্রু সঞ্চার হেতু, ধূম্র, বালুকা, অতি বমন, বা হঠাৎ স্থগিত হওন, এই সকল কারণ প্রযুক্ত বায়ু, পিত্ত, কফ, বা শোণিত বিকৃত হইয়া নেত্রাময়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু নেত্রাময় এক প্রকার নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন রোগ চক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে জন্মে। বেদনা, রক্তবর্ণ, বাষ্প-

পতন, জ্বালা, চক্ষে আলোক অসহ্য ইত্যাদি নেত্রাময়ের লক্ষণ।

চক্ষের চারি প্রকার দাহ হয়, তাহা বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্ম বা শোণিতের বিকার জন্য উৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু হইতে চক্ষের অন্যূন দশ প্রকার পীড়া জন্মে, নেত্রে বেদনা হওয়া ঐ পীড়ার প্রধান লক্ষণ, ঐ বেদনা প্রায় এক স্থানেই থাকে। এবং চক্ষে বালুকা পতনবৎ সর্ব্বদা যাতনা অনুভূত হয়। চক্ষের জলের অভাব জন্য ঐ যাতনা ঘটে। রোগীর মস্তক সর্ব্বদা ভারি বোধ হয় এবং চক্ষের জল শীতল অনুভূত হইয়া থাকে।

নেত্রদাহ, শোণিত এবং পুজ নিস্রবণ, শীতল দ্রব্য প্রদানে সুখানুভব হয়, নেত্র কুজ্ঝটিকা পূর্ণ, উষ্ণ এবং পীতবর্ণ অনুভূত হয়। এবং জল উষ্ণ বোধ হয়। পিত্ত হইতেই এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লেষ্মা জন্য চক্ষুভার বোধ এবং স্ফীত হয়, চুলকায়, এবং শীতল বোধ হয়। তৈলাক্ত প্রচুর বারি বর্ষণ হইয়া থাকে।

বিকৃত শোণিত জন্য চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, তাম্রবর্ণ বৎ বর্ষণ হয়। এই রোগে প্রথমাবস্থায় অসাবধানত হইলে চারি প্রকার কঠিন অবস্থা ঘটিতে পারে। আর্য্যেরা উহাকে "আদিমান্থ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। এতদবস্থায় যেন চক্ষু ছিন্ন হইয়াছে এরূপ অসহ্য যাতনা হয়। অর্দ্ধেক মস্তক ব্যাপিয়া কন্ কন্ করিয়া থাকে। ইহাতে কফের সংস্রব হইলে সপ্তাহের মধ্যেই চক্ষুটী নষ্ট হয়। রক্ত বিকৃত হইলে পঞ্চম দিবসে দর্শন যন্ত্র নষ্ট হয়। বায়ু হইতে ছয় দিনে, পিত্তে এক দিনেই নষ্ট হইতে পারে। ইহা অধিক দিন স্থায়ী হইলে আর পূর্ব্ববৎ যাতনা থাকে না। কিন্তু নেত্র হইতে সর্ব্বক্ষণ অল্প অল্প জল নির্গত হয়। চুলকায়, এবং চক্ষের তারা খোলা যায়। এ প্রকার বায়ু জনিত পীড়ায় অমোনযোগী হইলে তাহা কদাচ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আর এক প্রকার নেত্রাময়ের নাম বাতপর্য্যায়, বায়ু বিকৃত হইলে ঐ রোগ জন্মে। চক্ষু ও ভ্রূ ব্যথিত হয়, এবং রোগী নেত্রপত্র মুক্ত রাখিতে পারে না।

অন্য এক প্রকার পীড়া শুষ্কাখিপক বা শুষ্কাখিপত্র বলিয়া খ্যাত। নেত্র পত্র অত্যন্ত নিরস হয়, নেত্রপত্র পাকে, বেদনা হয়, দর্শনের বিঘ্ন হয়, এবং নেত্রপত্র মুদিত করিতে পারে না।

আর এক প্রকার নেত্রাময় অনুত্যয়বাতগ্রীবা বলিয়া উক্ত হয়। মস্তক, কর্ণ হনু প্রভৃতি স্থানের বায়ু শোণিত দূষিত হইলে ভ্রূ এবং নেত্রের যাতনা হইতে থাকে।

"অম্লাধ্যাসিত" এই নেত্রাময় অতি অম্ল ভোজন জন্য উৎপন্ন হয়। চক্ষু হরিৎ বর্ণ এবং উহার চারিদিকে রক্তের ন্যায় বোধ হয়। নেত্র স্ফীত হয় এবং নিয়ত বাষ্প নির্গত হয়।

"শিরোৎপাত" নেত্র রক্তবর্ণ হয়, বেদনাগ্রস্থ হয়, পুরাণ পীড়া হইলে ইহাকে "শিরাহর্ষ" বলে। তাম্র বর্ণ বাষ্প নিস্রব হয়। দৃষ্টির অবরোধ হয়।

চক্ষের এই সমস্ত সাধারণ পীড়া প্রাচীনেরা নিরূপিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অস্ত্রাদি দ্বারা এই সকল রোগের চিকিৎসা করিতেন। প্রাচীন আর্য্যেরা কত বড় মহা বিজ্ঞ ও মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, আট শত বৎসরের পরাধীন জাতির তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব হইলেও তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রবল ভক্তির ব্যাঘাত করিতে পারেন নাই।

ব্রণ শুক্ল পীড়া। চক্ষের উপর ভাগে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকার চিত্রের উপর দাগ হয়, উষ্ণ নিস্রব হয়। চক্ষের মধ্যে এক স্থান আছে, সেই স্থানে দাগ

হইলে বাষ্পপাত বা বেদনা হয় না। এবং এই দাগ পুত্তলির ভিতর না হইলে আরোগ্য হইতে পারে। ব্রণ দীর্ঘকাল বিস্তীর্ণ, এবং গাঢ় সন্নিবিষ্ট হইলে ইহা আরোগ্য হয় না। ঐ ব্রণ প্রযুক্ত মধ্যভাগ বসে গিয়া কিনারা উন্নত হইলে দর্শন শক্তি নষ্ট হয়।

অব্রণশুক্র। কৃষ্ণাবরণে বেদনা জ্বালা ও শুভ্র বর্ণ হইলে পীড়া আরোগ্য হয়। কিন্তু অধিক কাল পীড়া থাকিলে এবং শুভ্র বর্ণ বিস্তৃত হইলে আরোগ্য হয় না।

কৃষ্ণাবরণ নিষ্প্রভ এবং বেদনা যুক্ত হইলে পাকাতিয় রোগ বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কৃষ্ণাবরণে ঈষৎ রক্তাভ ব্রণ হইলে, ইহাকে অজাকায়ত রোগ বলে।

কৃষ্ণাবরণের মধ্যস্থলে মসুরিবৎ এক ক্ষুদ্র স্থূল বিন্দু আছে, ইহাকে দৃষ্টি কহাযায়। তাহাতে অব্যয় তেজ আছে, ইহাকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ রাখিলে চক্ষের জ্যোতি নষ্ট হয় না। ইহার উপর পীড়া হইলে অতিকষ্টে আরোগ্য হয়।

চক্ষের জালবৎ ত্বক সম্বন্ধীয় রোগ। চক্ষের অনেক গুলি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে আর্য্যেরা প্রতর্ণ পটল বলিতেন। প্রথম প্রতর্ণ বিকৃত হইলে পূর্ব্বপেক্ষা আরও লঘু দৃষ্টি হইয়া পড়ে।

তৃতীয়াবরণ বিকৃত হইলে প্রায় দর্শন শক্তির লোপহয়। এতদবস্থাকে লিঙ্গ নাশ বলে। বাতাধিক্যে রোগী সমুদয় পদার্থ রক্তবর্ণ দর্শন করে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শন হয়।

শুদ্ধ পিত্ত বিকৃতি জন্য চক্ষের জ্যোতি নষ্ট হয়। আর্য্যেরা উহাকে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টিবলিয়াছেন। এতদবস্থায় সমস্ত পদার্থ এবং অবয়ব পীতবর্ণ বোধ হয়। পিত্ত হইতে তৃতীয়াবরণ নষ্ট হইলে দিবসে দেখিতে পায় না কিন্তু রাত্রিকালে দেখিতে পায়।

ঐ রূপ শ্লেষ্মাজন্য শ্লেষ্মা বিদগ্ধ দৃষ্টিবলে। এতদবস্থায় সমস্ত শুভ্রবর্ণ বোধ হয়। তৃতীয় আবরণ নষ্ট হইলেও দিবসের দর্শন কদাচ অবরোধ হয় না।

সমস্ত ধূম্র বর্ণ দর্শন রোগকে “সমাদর্শর” বলে। শোক, জ্বর, বিরাগ, উগ্র শিরঃপীড়া জন্য এইরূপ দেখায়। দিবসে কখন কিছুই দর্শন হয় না কিন্তু রাত্রিতে সকলি দৃষ্ট হয়। ইহাকে “রসজাত” বলে। এই রূপ নানাবিধ কারণ জাত নেত্রাময়কে আর্য্যেরা নকুলান্ধ, গম্ভীরক, সনিমিত্ত, অনিমিত্ত, ইত্যাদি নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অকস্মাৎ চক্ষের আঘাত জন্য পীড়াকে অভিগত-হত দৃষ্টি বলিতেন। ইহা অসহ্য যন্ত্রণা দায়ক।

চক্ষের শ্বেতক্ষেত্রের রোগ।

এক খানি অতি সূক্ষ্ম লোহিত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ আবরণে চক্ষের শ্বেত ক্ষেত্র আবৃত হইলে উহাকে প্রস্তরিজর্ম রোগ বলে। উহার বৃদ্ধি হইলে উক্ত আবরণ শুভ্রবর্ণ হয় এবং তাহাকে শুক্লার্ম বলে। এই প্রকার শ্বেত ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পীড়া রক্তার্ম, আদি মাংসার্ম, স্তরজার্ম, সূক্তি, অর্জন, পিষ্টক, জাল, শিরজ, বলাশাক ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

নেত্রগ্রন্থি রোগ।

চক্ষের পাঁচটী গ্রন্থি আছে, তন্মধ্যে নয় প্রকার নেত্র গ্রন্থি রোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যখন পূজ জন্মে এবং অতিশয় বেদনা দায়ক হয়, ইহাকে পূজালিশ বলে। আর অতিশয় স্ফীত হয়, কিন্তু পূজ হয় না, বেদনাহীন, অথবা চুলকায়, ইহাকে উপনাহ বলে,

এবং বায়ু পিত্তাদির দোষ জন্য নেত্রগ্রন্থি রোগে চক্ষু দিয়া রক্ত পূজ শ্লেষ্মাদির পতন হয়, ইহার সাধারণ নাম নেত্রনাড়ি, কিন্তু অবস্থা বিশেষে স্পর্শ-স্রব, শ্লেষ্মস্রব, রক্তস্রব, পিত্তস্রব ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বাণিকা অলাঘি বলা যায়।

পাঠকবৃন্দ শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইবেন, নেত্রপত্র অথবা নেত্রের অন্য কোন গ্রন্থিতে এক প্রকার কীট উৎপন্ন হয়, এই রোগকে আর্য্যেরা কৃমিগ্রন্থী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নেত্রপত্রের রোগ।

নেত্রপত্রের একবিংশ প্রকার রোগের নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ সমস্ত অবস্থা বিশেষে উৎসঙ্গনি, কুম্ভিকা, পতাকি, বার্ত্তাশর্কর, সক্ষার্ষ, আর্ষবার্ত্তা, অঞ্জন নামিকা, বহলাবর্ত্ত, বর্ত্তাবন্ধ, কৃষ্ণাবর্ত্ত, বর্ত্ত-কার্দ্দম, সবাবর্ত্ত, প্রক্লিনাবর্ত্ত, অক্ষ্ণাবর্ত্ত, বাটহট্টাবর্ত্ত, অর্ব্বুদ, নৈমাস, সুনিতার্ষ, লঘান্নহ, বিষাবর্ত্ত, কুঞ্চার্ণ, পাককসাত, পাককপাত, ইত্যাদি নামে পরিজ্ঞাত আছে। কিন্তু এ সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণন করণ অবকাশ এবং যথেষ্ট স্থল সাপেক্ষ; নিদান শাস্ত্রের বাহুল্য রূপে সমালোচন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, এবং তদর্থে এতৎ প্রসঙ্গ আর্য্য-প্রবরে পরিগৃহীত হয় নাই; প্রাচীন আর্য্যেরা বিজ্ঞানকাণ্ডের কত উচ্চতর শিখরারোহণ করিয়া ছিলেন, তাহার নিদর্শন মাত্র আমরা প্রদর্শন করিতেছি, গুণগ্রাহী ধীমান পাঠকবৃন্দ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন্।

উপরোক্ত চক্ষুর পীড়ার প্রশমনার্থ আর্য্যেরা যে সমস্ত উপায় কল্পনা করিয়া ছিলেন, প্রাচীন সময়ে তাহা মনুষ্যের বুদ্ধি সাধ্যের অতীত ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

একাদশ প্রকার নেত্রাময় অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা উচ্ছিন্ন করতঃ চক্ষু আরোগ্য করিতেন। ক্ষুদ্র অস্ত্র দ্বারা পীড়িত স্থান ক্ষত করিয়া ৯ প্রকার রোগের উপশম করিতেন। ৫ প্রকার রোগে অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া, ১৫ প্রকার রোগে অস্ত্রাঘাতে ছিদ্র করিয়া, ১২ প্রকার বিভিন্ন শাস্ত্র দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করিতেন, কিন্তু সপ্তবিধ পীড়া কষ্টে আরোগ্য হইত, একাদশ বিধ পীড়া কদাচ আরোগ্য হইত কিন্তু দুই প্রকার কোন ক্রমেই আরোগ্য হইত না।

রোগীর চিকিৎসার প্রকরণ যথা—

রোগীকে তৈল মোক্ষণ করণান্তে উষ্ণ জলের সেক দেওয়া হইত এবং রেচনাভিপ্রেত ঔষধ সেবন করান হইত। শীতল জল দ্বারা নেত্র ধৌত করণ ও কোন কোন ওষধির ভাব্‌রা চক্ষে প্রদান করা হইত তৎসহযোগে পীতবস্ত্র নেত্রোপরি বেষ্টন করিয়া রাখা হইত উষ্ণ জলোত্তাপ প্রদানান্তে দুগ্ধ ও তণ্ডুল মিশ্রিত অণুবেল্লিক (পুল্‌টিস) পক্ক উষ্ণ মাংসের সহিত নেত্রে স্থাপন করা হইত। তৎপরে ডিকক্‌সন্ সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে পান করান হইত এবং এরণ্ড বৃক্ষের মূল ও পত্রের ডিকক্‌সন ছাগ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতেই রোগীর চক্ষে প্রদান করা হইত। পিত্ত কিম্বা শ্লেষ্মা হইতে কোন কোন রোগের উৎপত্তি হয়, এবং তাহার লক্ষণই বা কি, আর্য্যেরা সূক্ষ্মরূপে তত্তৎ কারণ যে আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিতেন ইহাও বোধ হইতেছে, কারণ তাঁহারা পিত্তাদি জন্য জাত নেত্রাময়ের বিশেষ বিশেষ হেতু, নিয়ম ও চিকিৎসার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা-পিত্ত জন্য চক্ষুরোগ জন্মিলে রক্তমোক্ষণ, রেচন এবং বিলেপন প্রদান করা হইত, কিন্তু শ্লেষ্মা জন্য রোগ জন্মিলে অন্য

থাকিলে তোমায় উচ্চ মনোবৃত্তি প্রদত্ত হইত না। উচ্চ বৃত্তি কি প্রকার? আপনাকে মহা ভাবাপন্ন করিবার এবং পৃথিবীকে মহা ভাবাপন্ন করিবার প্রবৃত্তি মনে করিয়া দেখ ঈশ্বর তোমাকে ধরণীর ঈশ্বর করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রেত এই যে, এক পক্ষে স্বভাব মহা পরিবর্ত্তনের অধীন। মানব-প্রকৃতি এরূপ না হইলে পৃথিবীর এত সুখোৎপত্তি হইত না। এত সুখের অধিকার কেবল পরিবর্ত্তন জন্য, যে তোমার এতাদৃশ শুভ পরিবর্ত্তনের প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করিবে সে তোমার দক্ষিণ হস্ত বা দক্ষিণ পদ, নাসিকা বা কর্ণ, কিন্তু ন্যায় প্রবৃত্তি কদাচ প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করে না। স্বর্গ যে এমন উচ্চ তাহাও উন্নতির পদাবনত। উন্নতি তোমার সম্মুখে কত মূল্যবান পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তোমায় আহ্বান করিতেছে। নেত্রোন্মীলন কর, গাত্রোত্থান কর, ঋষিরা নেত্র মুদ্রিত করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আপনারাই বলিয়াছেন ইহা তপস্যার যুগ নহে। আমাদের মনকে অরণ্য হইতে তাঁহারাই গৃহাভিমুখে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যদি কার্য্য না হইল, কোন সময়েও তবে আর উন্নতির মুখাবলোকন করিতে পারিবে না। সুতরাং ভীষণ অরণ্য মধ্যে শ্বাপদ পশুর সহবাস তোমার কল্যাণকর, ও শ্রেষ্ঠ মানব দেহ অবশ্যই অল্প প্রয়োজনীয়; কিন্তু বিশ্ব-বিধাতা যখন আমাদের উচ্চ মানসিক বৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, তখন মনুষ্যের উন্নতিই স্বভাবের অভিপ্রেত, সেই মহা ইচ্ছাই আমাদিগের শাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতি, সেই মহা ইচ্ছাই আমাদের নয়ন, জ্ঞান, পবিত্র আলোক, জীবনের লক্ষ্য রাখিয়া তদভিমুখে ধাবিত হও, ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহার কদাচ বিপরীত ব্যবস্থা নাই। যদি বল "কলিযুগে আমাদের শাস্ত্র ছাড়া এক পদও গমন করিবার অধিকার নাই" এদেশের লোককে ঋণ দায় যে ঋষিপ্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রে বদাচ সৎকার্য্য ও স্বাধীনতাকে বন্ধন করিয়া রাখে নাই। আর্য্য জাতির ধর্ম্ম যে এত গরীয়ান, ইহাই তাহার মুখ্য কারণ, এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র উন্নতির প্রতিবন্ধক কি না? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, এ দেশের স্বাধীনতার অবস্থায়, স্বাধীন জাতি কর্ত্তৃক যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সংসারের অসীম কল্যাণ সাধন হইয়াছে সংশয় মাত্র নাই। আমাদের দেশে সেই স্বাধীন হিন্দুরাজাদিগের প্রোজ্জ্বলাধিপত্যে কোন অব্যবস্থাই ধর্ম্ম নীতি বলিয়া ধর্ম্ম সংহিতায় স্থানাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। আর্য্য তেজঃপতন কালে সেই সকল কুনিয়ামক রীতি ও ব্যবস্থা আর্য্য সন্তানদিগের হৃদয়ে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। তাহা বলিয়া অদ্যাপি আমাদিগকেও সেই অসার রীতির দাসত্ব করিতে হইবে এমন কিছু কথা নয়, সুতরাং আমরা স্পষ্ট কথায় বলিতেছি পূর্ব্ব পুরুষ দিগের সঞ্চিত যে সকল সংসারের অপকারক নিয়ম অদ্যাপি আমাদিগের মস্তকে বহন করিতে হইতেছে, তাহা দূর করিলে ক্ষতি নাই। ঐ সমস্ত যাঁহাদের মস্তকে স্থল প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাদেরই নিকটে প্রত্যাগমন করুক, আমাদের স্বাধীন আর্য্য দিগের হৃদয়ে যে সকল প্রশংসনীয় বৃত্তি শোভা পাইয়াছিল, সেই সকল মনোবৃত্তিকে আমরা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনয়ন করি, ইহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিষেধ নাই, যে শাস্ত্র আমাদের এইরূপ স্বভাবের প্রতিকূল, সেই শাস্ত্রই ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য সকল কল্পিত করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যে শাস্ত্রের উপদেশে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে শাস্ত্রের এখন সমাদর

করা কেবল কঙ্কালাবশিষ্ট আর্য্য ধর্ম্মের পতন জন্য।

সদাশয় পাঠক গণ বলিতে পারেন যে, উপরোক্ত উক্তিতে আর্য্য-প্রবরের অনুদারতার পরিচয় হইতেছে, কেন না জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ উক্তি বর্ত্তমান সমাজে কখনই গ্রাহ্য হইবে না। যে পর্য্যন্ত কল্পিত ধর্ম্মের আদর থাকিবে সে পর্য্যন্ত লোকের হৃদয় আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবে না, একথা সত্য। আর অবতারাদির উপাসনায় সত্যের তৃপ্তিকর আস্বাদ গ্রহণে মানবের অভিরুচি নাই। মূঢ়তা বশতঃ প্রকাশ হয় যে কাল্পনিক সূর্য্য আলোক প্রদান করুন, এক পক্ষে তোমা হইতে পৃথিবীর কুমত অস্তমিত হউক, সেই ঈশ্বরীয় ইচ্ছা তোমা হইতে সিদ্ধ হইবে। প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ হইয়া ভূলোকের অন্ধকার বিমোচন কর। সেই মহাতেজ তোমাতে বেষ্টিত আছে। সমুদ্র পরিক্রমণ কর, উন্নত গিরি উল্লঙ্ঘন কর, ব্যোমযানে স্বর্গে আরোহণ কর, এ সমস্ত তোমার সাধ্যায়ত্ত, পশুর সাধ্য নহে। কিন্তু তোমার সেই ভাবের পরিবর্ত্তন এই পৃথিবী তোমাকে প্রত্যক্ষ করাইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্মরণ কর যে মানব-প্রকৃতি কেবল পরিবর্ত্তনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মহান বিশ্বের মহাসম্রাটের মহন্নিয়মকে আর আমরা ভয়ঙ্করি না, জড়ের সম্মুখে দেবতাকে প্রণাম করি, ঘোর নাস্তিকতার চিহ্ন ইহা হইতে আর কি হইতে পারে।

সত্যই আমরা উন্নত মনকে নিতান্তই মলিন করিয়াছি, আমাদের আত্মার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, বুদ্ধির প্রতিভা মাত্র নাই, অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা, মনের পরিশুদ্ধতা নাই, নয়ন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেই দুর্ব্বলতা দূরীকৃত করণ ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই, সেই হেতু কি সদুপায় হইতে পারে? বিশুদ্ধ আত্মার ক্রিয়া হৃদয় যন্ত্রে অবিশ্রান্ত চলুক, এই মাত্র সদুপায়, কিন্তু সেই বিশুদ্ধ ভাবের প্রিয় হইতে হইলে সমাজের ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে হয়, তন্নিবন্ধন সমাজের অপরিসীম অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সে প্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে কাহার অভিলাষ হয়? সমাজের অনিষ্ট ঘটাইতে আমরা কাহাকেই বলিনা, যে হেতু সমাজ বড়ই প্রিয়বস্তু। মনুষ্য বর্গের বড় কল্যাণ কর, কিন্তু দেশীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে একবারে সংহার করাও ভাল নয়।

বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক কতগুলি নিয়ম প্রচলিত আছে, যে সেই সকল কেবল অনিষ্টের মূল ব্যতীত কিছুই উপকার দায়ক নহে, অথচ আমরা তাহার বশীভূত হইয়া আছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐ রূপ আবদ্ধ; তাহার নিকট ন্যায়পরতা কর্ত্তব্যবুদ্ধি ঘাটি মানিয়াছে। বিশুদ্ধ জীবন হইতে হইলে উহার দৃঢ় পাশ হইতে অগ্রেই মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা যে প্রকার উদার শিক্ষা করাইয়া ছিলেন, নব্য ব্যবস্থাপকেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কেহ সমস্তের প্রতিপালন করাতেই আত্মাকে হীনদশাভিভূত করা হয়। হীনতাকে আশ্রয় করিয়া আর আমরা কতকাল অসত্যকে প্রশ্রয় দিব। এই হীনতা নাশের একটি পন্থা আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে কেহই কর্ণপাত করেন না বিশ্ব পৃথিবীর যখন যে দেশে ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, তখন ঐ পন্থাই সুভগ ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। আমাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মকে সম্পূর্ণ স্থায়ী রাখিয়া কেবল এক মাত্র সত্যের পথ উপাসনা কাণ্ড প্রবর্ত্তন করা বিধেয়।

———

রূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা নিরূপিত করিয়াছেন। সেই সকল উল্লেখ প্রস্তাব করিতে হইলে বাহুল্য হয়, সুতরাং তাহাতে ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

বালক এবং যুবাদিগের সাধারণ চক্ষুপীড়া প্রায় ৭৬ প্রকার। কিন্তু মাতৃ-স্তনদূষিত কুকুনক নামে অন্য এক পীড়া হয়, উক্ত পীড়া দ্বারা নেত্র পত্রের যথেষ্ট অপকার হইয়া থাকে। উহার লক্ষণ নাসিকা, কপোল, এবং চক্ষু সর্ব্বদা চুল্‌কায়। আলোক অত্যন্ত অসহ্য বোধ হয়, এবং অতিরেক বাষ্পপাত হয়। এ রোগে নেত্রপত্রে অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক্, তৎপরে অন্যান্য বিবিধ পদার্থের লেপন এবং পান করাইতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন নেত্র-রোগের নানা প্রকার প্রকৃতি আছে, তাহা গ্রন্থে সম্যক বর্ণন অসাধ্য এই হেতু আর্য্যেরা বলিয়াছেন, চিকিৎসকেরা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রোগের অবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করিবেন। কিন্তু নিম্ন লিখিত রোগে তাঁহারা অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন।

উৎসিঞ্জিনি,	বহলাবর্ত্ত,
হর্দ্দমাবর্ত্ত,	শাবাবর্ত্ত
বন্ধ্যাবর্ত্ত,	ক্লিষ্টাবর্ত্ত,
পাত্তক,	কম্ভিকিনি,
বাতসরকারা,	

উপরোক্ত অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে রোগীকে কোন বামক বা রেচক ঔষধ সেবন করাইতেন। এবং স্নিগ্ধ অল্প আলোক যুক্ত এক গৃহে বসাইতেন। এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও চতুর্থাঙ্গুলি দ্বারা চক্ষের পত্র প্রভেদ করিয়া এক খণ্ড কোমল নেকড়া উষ্ণ জলে নিমজ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুকে ভিজাইতেন তৎপরে অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন এবং ক্রমাগত সেক দিতেন। এবং বিবিধ প্রলেপ দিয়া ও অন্যান্য প্রকরণ অনুযায়ী কার্য্য করিতেন।

সরজাল, সর্ব্বাণিকা, অর্শ, সরস্কর্শ, এই চারি রোগে কোন স্থল সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তন করিতে হয়।

সুশ্রুতে অস্ত্রপ্রয়োগের জন্য বিশেষ গৃহের নিরূপণ করিয়াছেন। রোগীকে উক্ত গৃহে আহারাদি প্রদান করা হইত। পশ্চাল্লিখিত রোগে অস্ত্র প্রয়োগ করা হইত না।

সুকাকিপক, কফ বিদগ্ধ দৃষ্টি, পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি, শক্র।

উর্জন,	পিষ্টক,
আমলকি,	অকিলনাবর্ত্ত,
দানাদর্ষি,	শুক্তি,
প্রিলেল্‌নাবর্ত্ত,	বনাশাবর্ত্ত,

বাহ্যাঘাত জন্য রক্ত মোক্ষণ পশ্চাল্লিখিত রোগের ব্যবস্থা।

শিরগাল,	শিরাহর্ষ,
উননাপক,	পবনুনটহ,
পৌলাস।	

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সঙ্ক্ষেপে এইস্থলে প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। পরন্তু উপসংহার কালে আমাদের কয়েকটা কথা বক্তব্য আছে। সর্ উইলিয়ম জোন্স্ ও বলিয়াছেন আশিয়া খণ্ডের কোন মনুষ্য সমাজে প্রকৃত চিকিৎসা গ্রন্থ নাই। আমাদের দেশেও অনেকের সংস্কার জন্মিয়াছে ভারতবর্ষের লোকেরা কেবল কতকগুলি সে কালের ব্রহ্মজ্ঞান লয়ে বিতণ্ডা করিতেন, তাঁহাদের পদার্থ জ্ঞান ছিল না। আপনারা যেমন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলেন, আমাদেরও তাই শিখাইয়া গিয়াছেন। রাশি রাশি সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল ভট্টাচার্য্যদিগের জীবিকার সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। ব্রিটীশ জাতিকে শত শত ধন্যবাদ যে, কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের এই অনুযোগে আমরা এক্ষণে সত্যের বল প্রাপ্ত হইতেছি। অন্ধ লোকদিগকে আমরা

উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, এই পৃথিবীর যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার মধ্যে, দিব্য আলোকেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা সেই সত্যের আলোক হারাইয়াছ। সত্য জ্যোতির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট আলোক প্রার্থনা কর, তোমাদের অন্ধকার দূর হউক, ভারত বর্ষীয় অপার বিবেকসম্পন্ন পূজ্য পাদ প্রাচীন ঋষিদিগের বিজ্ঞান শাস্ত্রের দর্শন লাভকর, তোমাদের চৈতন্য হউক, স্বদেশের প্রতি দ্বেষত্যাগ কর তোমাদের জন্ম সফল হউক, এক্ষণে অনেকেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন দিগের মত অপেক্ষা নূতন মতের অনেক সংস্কার হইয়াছে। ইহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন তত্ত্বের আমরা গোড়া নহি এটীও যেন তাঁহাদিগের স্মরণ থাকে। আমরা এই বলিতে চাই যে, প্রাচীনেরা বিজ্ঞান এবং পদার্থ বিদ্যার ভূরি আলোচনা প্রভাবেই এত দ্দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রে অক্ষয় খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সেই অপরিসীম পরিশ্রমেই ভূমণ্ডলের অসীম কল্যাণ হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় সং বৈদ্যের অন্ন হয় না কিন্তু এক গণ্ডমুর্খ কম্পাউণ্ডার আমাদের চক্ষের উপর ধন্বন্তরি হইতেছে এটী আমাদের চক্ষে বিষবৎ বোধ হয় ৯ খ্রীষ্টাব্দে সরাসিন মুসলমানেরা ইউরোপে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র অথবা বৈদ্য শাস্ত্র প্রচার করে। পরে ইউরোপীয়েরা ১৫ বা ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে এই মহা বিজ্ঞানময় চিকিৎসা শাস্ত্রে সামান্যমাত্র দর্শন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা কহিয়া থাকে ইজিপ্ট এবং গ্রীস তাহাদের সভ্যতার প্রসূতী, প্রাচীন সময়ে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপে প্রবিষ্ট হইলে ভারত বর্ষই ইজিপ্ট গ্রীস, ক্যালডিয় প্রভৃতি দেশের সভ্যতার পিতামহী হইত। সাধারণ লোক দিগের এক বিজাতীয় অনভিজ্ঞতা গাঢ় প্রবল হইতেছে যে, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র কেবল অর্থ উপার্জনের কৌশল। এতাদৃশ লঘু চেতন লোকদিগের প্রতিবোধের জন্য এ প্রকার প্রসঙ্গের আন্দোলন করা বিধেয় বোধ হইয়াছে।

সংস্করণ।

প্রকৃতির নিয়ম নিত্য, দুর্লঙ্ঘনীয়. অদ্য যে সূর্য্যোদয় দেখিবে কল্যও সেই সূর্য্যোদয় দেখিবে, কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা সর্ব্বদা সমভাবে স্থায়ী নয়, অদ্য যাহা দেখিলে কল্য তদপেক্ষা ভাবান্তর লক্ষিত হইবে। মনুষ্যের যে হীনাবস্থা দর্শন করিয়াছিলে অদ্য সে অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তৎসঙ্গে কত নগর সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তন হইল। কত শিল্প, সঙ্গীত সাহিত্যের পরিবর্ত্তন হইল। ভূপৃষ্ঠে কত বিশাল অরণ্য বৃহৎ নগর লুক্কায়িত হইল, মনুষ্যের যে জীর্ণ পর্ণ কুটীর দর্শন করিয়া ছিলে, এক্ষণে সেই উলঙ্গ ধনুর্ব্বাণ ধারী মানবের সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিলোকন কর। স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন না হইলেও এসমস্তের পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে সর্ব্বদা ঘটিতেছে এবং এরূপ পরিবর্ত্তন ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। ইহা কেবল মানবেই সম্ভবে। তদ্ধেতুক এ পরিবর্ত্তনে বিশেষ প্রয়োজন আছে। ধর্ম্মগ্রন্থে থাকুক আর নাই থাকুক কিন্তু এ পরিবর্ত্তন শ্রেয়ঃ এবং জগৎস্রষ্টা কেবল মনুষ্যকেই তাহার অধিকারী করিয়াছেন। অতএব আমারও এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কেবল প্রয়োজনীয় নয়, ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত।

আমার এ প্রকার পরিবর্ত্তনে কি হইবে? আমি বেশ আছি, আমার আর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে বৈ কি। প্রয়োজন না

থাকিলে তোমায় উচ্চ মনোবৃত্তি প্রদত্ত হইত না। উচ্চ বৃত্তি কি প্রকার? আপনাকে মহা ভাবাপন্ন করিবার এবং পৃথিবীকে মহা ভাবাপন্ন করিবার প্রবৃত্তি মনে করিয়া দেখ ঈশ্বর তোমাকে ধরণীর ঈশ্বর করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রেত এই যে, এক পক্ষে স্বভাব মহা পরিবর্ত্তনের অধীন। মানব-প্রকৃতি এরূপ না হইলে পৃথিবীর এত সুখোৎপত্তি হইত না। এত সুখের অধিকার কেবল পরিবর্ত্তন জন্য, যে তোমার এতাদৃশ শুভ পরিবর্ত্তনের প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করিবে সে তোমার দক্ষিণ হস্ত বা দক্ষিণ পদ, নাসিকা বা কর্ণ, কিন্তু ন্যায় প্রবৃত্তি কদাচ প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করে না। স্বর্গ যে এমন উচ্চ তাহাও উন্নতির পদাবনত। উন্নতি তোমার সম্মুখে কত মূল্যবান পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তোমায় আহ্বান করিতেছে। নেত্রোন্মীলন কর, গাত্রোত্থান কর, ঋষিরা নেত্র মুদ্রিত করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আপনারাই বলিয়াছেন ইহা তপস্যার যুগ নহে। আমাদের মনকে অরণ্য হইতে তাঁহারাই গৃহাভিমুখে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যদি কার্য্য না হইল, কোন সময়েও তবে আর উন্নতির মুখাবলোকন করিতে পারিবে না। সুতরাং ভীষণ অরণ্য মধ্যে শ্বাপদ পশুর সহবাস তোমার কল্যাণকর, ও শ্রেষ্ঠ মানব দেহ অবশ্যই অল্প প্রয়োজনীয়; কিন্তু বিশ্ব-বিধাতা যখন আমাদের উচ্চ মানসিক বৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, তখন মনুষ্যের উন্নতিই স্বভাবের অভিপ্রেত, সেই মহা ইচ্ছাই আমাদিগের শাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতি, সেই মহা ইচ্ছাই আমাদের নয়ন, জ্ঞান, পবিত্র আলোক, জীবনের লক্ষ্য রাখিয়া তদভিমুখে ধাবিত হও, ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহার কদাচ বিপরীত ব্যবস্থা নাই। যদি বল "কলিযুগে আমাদের শাস্ত্র ছাড়া এক পদও গমন করিবার অধিকার নাই" এদেশের লোককে বুঝান দায় যে ঋষিপ্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রে বদাচ সৎকার্য্য ও স্বাধীনতাকে বন্ধন করিয়া রাখে নাই। আর্য্য জাতির ধর্ম্ম যে এত গরীয়ান, ইহাই তাহার মুখ্য কারণ, এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র উন্নতির প্রতিবন্ধক কি না? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, এ দেশের স্বাধীনতার অবস্থায়, স্বাধীন জাতি কর্ত্তৃক যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সংসারের অসীম কল্যাণ সাধন হইয়াছে সংশয় মাত্র নাই। আমাদের দেশে সেই স্বাধীন হিন্দুরাজাদিগের প্রোজ্জ্বলাধিপত্যে কোন অব্যবস্থাই ধর্ম্ম নীতি বলিয়া ধর্ম্ম সংহিতায় স্থানাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। আর্য্য তেজঃপতন কালে সেই সকল কুনিয়ামক রীতি ও ব্যবস্থা আর্য্য সন্তানদিগের হৃদয়ে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। তাহা বলিয়া অদ্যাপি আমাদিগকেও সেই অসার রীতির দাসত্ব করিতে হইবে এমন কিছু কথা নয়, সুতরাং আমরা স্পষ্ট কথায় বলিতেছি পূর্ব্ব পুরুষ দিগের সঞ্চিত যে সকল সংসারের অপকারক নিয়ম অদ্যাপি আমাদিগের মস্তকে বহন করিতে হইতেছে, তাহা দুর করিলে ক্ষতি নাই। ঐ সমস্ত যাঁহাদের মস্তকে স্থল প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাদেরই নিকটে প্রত্যাগমন করুক, আমাদের স্বাধীন আর্য্য দিগের হৃদয়ে যে সকল প্রশংসনীয় বৃত্তি শোভা পাইয়াছিল, সেই সকল মনোবৃত্তিকে আমরা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনয়ন করি, ইহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিষেধ নাই, যে শাস্ত্র আমাদের এইরূপ স্বভাবের প্রতিকূল, সেই শাস্ত্রই ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য সকল কল্পিত করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যে শাস্ত্রের উপদেশে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে শাস্ত্রের এখন সমাদর

করা কেবল কঙ্কালাবশিষ্ট আর্য্য ধর্ম্মের পতন জন্য।

সদাশয় পাঠক গণ বলিতে পারেন যে, উপরোক্ত উক্তিতে আর্য্য-প্রবরের অনুদারতার পরিচয় হইতেছে, কেন না জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ উক্তি বর্ত্তমান সমাজে কখনই গ্রাহ্য হইবে না। যে পর্য্যন্ত কল্পিত ধর্ম্মের আদর থাকিবে সে পর্য্যন্ত লোকের হৃদয় আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবে না, একথা সত্য। আর অবতারাদির উপাসনায় সত্যের তৃপ্তিকর আস্বাদ গ্রহণে মানবের অভিরুচি নাই। মূঢ়তা বশতঃ প্রকাশ হয় যে কাল্পনিক সূর্য্য আলোক প্রদান করুন, এক পক্ষে তোমা হইতে পৃথিবীর কুমত অস্তমিত হউক, সেই ঈশ্বরীয় ইচ্ছা তোমা হইতে সিদ্ধ হইবে। প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ হইয়া ভূলোকের অন্ধকার বিমোচন কর। সেই মহাতেজ তোমাতে বেষ্টিত আছে। সমুদ্র পরিক্রমণ কর, উন্নত গিরি উল্লঙ্ঘন কর, ব্যোমযানে স্বর্গে আরোহন কর, এ সমস্ত তোমার সাধ্যায়ত্ত, পশুর সাধ্য নহে। কিন্তু তোমার সেই ভাবের পরিবর্ত্তন এই পৃথিবী তোমাকে প্রত্যক্ষ করাইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্মরণ কর যে মানব-প্রকৃতি কেবল পরিবর্ত্তনের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মহান বিশ্বের মহাসম্রাটের মহন্নিয়মকে আর আমরা ভয়করি না, জড়ের সম্মুখে দেবতাকে প্রণাম করি, ঘোর নাস্তিকতার চিহ্ন ইহা হইতে আর কি হইতে পারে।

সত্যই আমরা উন্নত মনকে নিতান্তই মলিন করিয়াছি, আমাদের আত্মার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, বুদ্ধির প্রতিভা মাত্র নাই, অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা, মনের পরিশুদ্ধতা নাই, নয়ন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেই দুর্ব্বলতা দূরীকৃত করণ ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই, সেই হেতু কি সদুপায় হইতে পারে? বিশুদ্ধ আত্মার ক্রিয়া হৃদয় যন্ত্রে অবিশ্রান্ত চলুক, এই মাত্র সদুপায়, কিন্তু সেই বিশুদ্ধ ভাবের প্রিয় হইতে হইলে সমাজের ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে হয়, তন্নিবন্ধন সমাজের অপরিসীম অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সে প্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে কাহার অভিলাষ হয়? সমাজের অনিষ্ট ঘটাইতে আমরা কাহাকেই বলিনা, যে হেতু সমাজ বড়ই প্রিয়বস্তু। মনুষ্য বর্গের বড় কল্যাণ কর, কিন্তু দেশীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে একবারে সংহার করাও ভাল নয়।

বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক কতগুলি নিয়ম প্রচলিত আছে, যে সেই সকল কেবল অনিষ্টের মূল ব্যতীত কিছুই উপকার দায়ক নহে, অথচ আমরা তাহার বশীভূত হইয়া আছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐ রূপ আবদ্ধ; তাহার নিকট ন্যায়পরতা কর্ত্তব্যবুদ্ধি ঘাটি মানিয়াছে। বিশুদ্ধ জীবন হইতে হইলে উহার দৃঢ় পাশ হইতে অগ্রেই মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা যে প্রকার উদার শিক্ষা করাইয়া ছিলেন, নব্য ব্যবস্থাপকেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কেবল সমস্তের প্রতিপালন করাতেই আত্মাকে হীনদশাভিভূত করা হয়। হীনতাকে আশ্রয় করিয়া আর আমরা কতকাল অসত্যকে প্রশ্রয় দিব। এই হীনতা নাশের একটি পন্থা আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে কেহই কর্ণপাত করেন না বিশ্ব পৃথিবীর যখন যে দেশে ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, তখন ঐ পন্থাই নূতন ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়াছে। আমাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মকে সম্পূর্ণ স্থায়ী রাখিয়া কেবল এক মাত্র সত্যের পথ উপাসনা কাণ্ড প্রবর্ত্তন করা বিধেয়।

———

অপ্পয় দীক্ষিত।

অপ্পয় দীক্ষিত দ্রাবীড় দেশীয় এক মহা সম্ভ্রমান্বিত শৈব ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চি নগরের প্রায় চত্বারিংশৎ জ্যোতিষী ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব আদিপোলামঅগ্রহর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তদীয় পিতার নাম নারায়ণ দীক্ষিত। অপ্পয় দীক্ষিত উপরোক্ত পণ্ডিতের ঔরসে ষোড়শ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকাল বর্ত্তী প্রবীণ দার্শনিকেরা তাঁহাকে শিবতেজসম্ভূত মহাযোগেশ্বর শিব বলিয়া অতিশয় মান্য করিতেন। অপ্পয় দীক্ষিত সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বেদান্ত দর্শনাদি শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ সংস্কার জন্মিয়াছিল, তদর্থে প্রাচীন প্রবাদানুসারেই তাঁহাকে শিবতুল্য সকলেই সম্মান করিত।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের সম্যক আলোচনা করিয়া ছিলেন, তদ্ভিন্ন বহুতর বিজ্ঞানেরও আলোচনা করেন।

অপ্পয় দীক্ষিত শিবোপাসনায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তৎপ্রযুক্ত তাঁহার "শিবভক্ত" অথবা শৈব উপাধি অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি তিনটী দার পরিগ্রহ করেন। উক্ত তিন পত্নীর গর্ভে একাদশ পুত্র জন্মে!

অপ্পয় দীক্ষিত পূর্ণ বয়সাধিক্যে জীর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে চন্দ্রগিরির সুবিখ্যাত মহিপাল বেঙ্কটপতি রায়ালুর সম্ভ্রম এবং বদান্যতা ও গুণগ্রাহিতা লাভ করেন। এই লাভ তাঁহার স্বীয় পরিশ্রমজাত বিদ্যা হইতেই উপার্জ্জিত হইয়া ছিল, যে হেতু বেঙ্কট পতি রায়ালুর সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতকেই তিনি পরাভূত করিয়া ছিলেন। এই বিচার প্রকাশ্য সভাস্থলেই সম্পাদিত হয়; এবং বিচার্য্য প্রসঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপর বিবিধ বিষয়ের বিচার হইয়াছিল। শিব, বিষ্ণু, অভিন্ন পরমাত্মা, ইহা তিনি প্রতিপন্ন করত শৈব এবং বৈষ্ণব দিগকে প্রবোধিত করিয়া ছিলেন। উপরোক্ত মহিপাল ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জীবিকা এবং তদীয় ছাত্রদিগের পাঠব্যয় সম্পাদন জন্য ভূমি প্রদান করিয়া ছিলেন। অপ্পয় দীক্ষিত পঞ্চাল্লিত গ্রন্থাবলি শৈব শিষ্য দিগের উপদেশ জন্য প্রণয়ন করেন।

১। শিবার্চ্চন-চন্দ্রিকা, ৩২ অধ্যায়।

২। শিব-তত্ত্ব-বিবেক, ২০ অধ্যায়।

৩। শিব-মণি-দীপিকা।

৪। আত্মার্পণ, একশত কাব্য স্তবক।

পূর্ব্বোক্ত তিন খানি গ্রন্থ তিনি নানাপ্রকার ধর্ম্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর রচনা করেন। এবং শেষ আত্মার্পণ নামক গ্রন্থ সমাধা করেন। এই গ্রন্থ সমগ্র দক্ষিণ দেশে অতি মান্য এবং পরম সমাদরণীয়। উক্ত গ্রন্থ সমাপ্তির পরই এরূপ লোকপ্রবাদ বা জনশ্রুতি প্রচার হইয়াছিল, যে অপ্পয় দীক্ষিত দৈবানুকম্পায় অমরত্ব লাভ করিয়া তাহা মৌখিক রচনা করেন।

অপ্পয় দীক্ষিত তৎপরে ত্রিচিনপিলি, তাঞ্জোর, এবং মথুরা প্রভৃতি রাজ্যের অধীশ্বর গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। এবং উক্ত নৃপতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণের এবং পরম পূজ্য স্বভাবের বিহিত পুরস্কার জন্য যথোচিত আনুকূল্য এবং অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। অনন্তর অপ্পয় দীক্ষিত কাবেরী তটে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী নানা প্রকার কঠোর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। তত্তাবৎ এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু সমাজ মধ্যে এত